আল-উম্মাহ

মাসিক জার্নাল ■ বর্ষ ১ ■ সংখ্যা ৬ ■ অক্টোবর ২০২৬ www.al-ummah.org

সন্ধিক্ষণে উপসাগরীয় অঞ্চল

আল-উম্মাহ
www.al-ummah.org

প্রবন্ধ জমাদানের নির্দেশিকা

আল-উম্মাহ এমন সু-লিখিত প্রবন্ধকে স্বাগত জানায় যা গভীরতা, স্পষ্টতা এবং বিশ্লেষণধর্মী দৃঢ়তা প্রদর্শন করে। প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সুসংগঠিত বিশ্লেষণ ও শক্তিশালী প্রেক্ষাপটগত বোঝাপড়া থাকতে হবে। আমরা বৈশ্বিক ভূরাজনীতি, মুসলিম বিশ্ব, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি, এবং বিস্তৃত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত রূপান্তর নিয়ে অবদান আহ্বান করি। জমা দেওয়ার আগে অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত শর্তাবলী লক্ষ্য করুন:

- প্রবন্ধটি ১,০০০ থেকে ১,৩০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে এবং পরিষ্কার ও পরিমার্জিত বাংলায় লেখা থাকতে হবে।
- এতে যুক্তিসংগতভাবে উপস্থাপিত মতামত থাকতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।
- এটি অবশ্যই মৌলিক এবং পূর্বে অপ্রকাশিত হতে হবে। তথ্যের যথার্থতা, যথাযথ সূত্র প্রদান এবং বৌদ্ধিক সততা বজায় রাখার দায়িত্ব লেখকের।
- জমা দেওয়া সকল লেখা সম্পাদকীয় পর্যালোচনার আওতায় যাবে।
- স্পষ্টতা, শৈলী এবং দৈর্ঘ্যের জন্য প্রবন্ধ সম্পাদনার অধিকার আল-উম্মাহ সংরক্ষণ করে।
- প্রকাশ নিশ্চিত নয়।
- জমা দেওয়ার সময় লেখকের পূর্ণ নাম এবং সংক্ষিপ্ত জীবনী অন্তর্ভুক্ত করুন।
- জমা পাঠানোর ঠিকানাঃ info@al-ummah.org

কপিরাইট নোটিশ

আল-উম্মাহ ওয়েবসাইট এবং এর মুদ্রিত ও ডিজিটাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সকল প্রবন্ধ ও বিষয়বস্তু প্রযোজ্য কপিরাইট আইনের আওতায় সুরক্ষিত এবং আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের বৌদ্ধিক সম্পত্তি হিসেবে সংরক্ষিত।

অন্যথা উল্লেখ না থাকলে, এই প্রকাশনার কোনো অংশ পূর্ব লিখিত অনুমতি ছাড়া পুনরুৎপাদন, সংরক্ষণ, বা কোনোভাবে প্রেরণ করা যাবে না– তা ইলেকট্রনিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে হোক না কেন।

লেখা জমা দেওয়ার মাধ্যমে লেখক স্বীকার ও সম্মত হন যে, গ্রহণ ও প্রকাশের পর প্রকাশিত উপাদানের কপিরাইট আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের অধীনে থাকবে। পৃথক প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত সংশ্লিষ্ট লেখকের নিজস্ব এবং তা ফাউন্ডেশনের মতামতের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে মিল নাও থাকতে পারে।

উপসাগরীয় সংকটের গভীরে আলো ফেলা জরুরি

অশান্তির উত্তাপে আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে উপসাগরীয় অঞ্চল। ইসরাইলের উসকানিতে ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যে সামরিক সংঘাতের সূচনা করেছিল, তা এখন প্রতিবেশী দেশগুলোর সীমান্ত পেরিয়ে নতুন যুদ্ধের পরাকাষ্ঠা তৈরি করেছে–বিশেষ করে দক্ষিণ ইয়েমেনে। সেখান থেকে হুতি বিদ্রোহীরা সৌদি আরবকে লক্ষ্যবস্তু করায় দেশটির বিভিন্ন শহর, কৌশলগত জ্বালানি কেন্দ্র এবং গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পরিবহন রুটগুলো তীব্র ঝুঁকিতে পড়েছে।

ইরানের 'প্রতিরোধ অক্ষের' (অ্যাক্সিস অব রেজিস্ট্যান্স) অংশ হিসেবে ইয়েমেনের স্থানীয় এই সশস্ত্র গোষ্ঠীটি দেশটির রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং প্রধান অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্পদগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তারে সক্রিয় রয়েছে। সৌদি আরবের মূল বক্তব্য হলো, হুতিদের এই উত্থানকে কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না; কারণ এতে ইরান কার্যত সৌদি সীমান্তের একেবারে কাছে ঘাঁটি গেড়ে বসবে, যা রিয়াদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য সরাসরি হুমকি।

অশান্তির উত্তাপে আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে উপসাগরীয় অঞ্চল। ইসরাইলের উসকানিতে ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যে সামরিক সংঘাতের সূচনা করেছিল, তা এখন প্রতিবেশী দেশগুলোর সীমান্ত পেরিয়ে নতুন যুদ্ধের পরাকাষ্ঠা তৈরি করেছে–বিশেষ করে দক্ষিণ ইয়েমেনে

তবে হুতিদের সামনে এই পথ ততটা সুগম নয়। কারণ, একাধিক যুদ্ধক্ষেত্রে সৌদি সমর্থিত ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইয়েমেনি সরকারি বাহিনী ইরান-সমর্থিত এই গোষ্ঠীর ওপর জোর চাপ সৃষ্টি করে রেখেছে। তা সত্ত্বেও, মাঠপর্যায়ের এই নাটকীয় পরিবর্তন উপসাগরীয় অঞ্চলের সরকার ও বৈশ্বিক বিশ্লেষকদের চিরাচরিত চিন্তাভাবনার গণ্ডি পেরিয়ে নতুন কৌশল নিয়ে ভাবতে বাধ্য করছে।

আমাদের সাম্প্রতিক প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে আমরা এই ভূ-রাজনৈতিক টানাপোড়েনকেই মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে বেছে নিয়েছি। তবে মধ্যপ্রাচ্যের এই চলমান ঘটনাপ্রবাহের গভীরে প্রবেশ করলে আরও অনেক রূঢ় সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সৌদি আরবের তথাকথিত ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্র হুট করেই হুতিদের সঙ্গে এক সমঝোতায় পৌঁছেছে–যেখানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলকে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে এবং বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত জলসীমায় তাদের জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে সৌদি আরবকে এক গভীর সংকটের মুখে একা ফেলে দেওয়া হলো। উপসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের বহু প্রচারিত 'নিরাপত্তা ছাতা' আজ কার্যত তছনছ। এতে আরও একবার প্রমাণিত হলো যে, উপসাগরীয় মিত্রদের সঙ্গে তাদের যাবতীয় বন্ধুত্বের মূল উদ্দেশ্য কেবল নিজেদের এবং ইসরাইলের স্বার্থ হাসিল করা।

উল্লেখ্য, চলতি মাসে 'আল-উম্মাহ'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম ছিল ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক ইসলামি প্রকাশনা সম্মেলন'-এ আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাকির হোসাইনের অংশগ্রহণ। সম্মেলনটিকে তিনি 'বিশ্বব্যাপী ইসলামি প্রকাশনার জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এক ঐতিহাসিক প্ল্যাটফর্ম' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

বর্তমান সংখ্যার একটি বিশেষ প্রতিবেদনে এই সম্মেলনের তাৎপর্য এবং ভবিষ্যতের ইসলামি প্রকাশনা জগতে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রধান সম্পাদক

আল-উম্মাহ

মা সি ক জা র্না ল

উপদেষ্টা পরিষদ

অধ্যাপক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

অধ্যাপক ড. এম কবির হাসান

অধ্যাপক ড. নাকিব নসরুল্লাহ

প্রধান সম্পাদক

মোহাম্মদ জাকির হোসেন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মাসুমুর রহমান খলিলী

সম্পাদনা সহযোগী

দ্বীন মোহাম্মাদ দুখু

ডিজাইন অ্যান্ড গ্রাফিক্স

এম. জামান

বর্ষ ১ অক্টোবর ২০২৬ সংখ্যা ৬

তুরস্কের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতার নতুন সম্ভাবনা পৃ. ৪

৬ ইস্তাম্বুল সম্মেলনে বৈশ্বিক প্রকাশক প্ল্যাটফর্মের পরিকল্পনা

১৮ কাবুল ও ইসলামাবাদে তুর্কি গোয়েন্দাপ্রধানের সফরের তাৎপর্য

২১ শান্তি ও যুব ক্ষমতায়নে ক্রীড়ার ভূমিকার ওপর জোর ওআইসির

২৪ ব্রিকস সম্মেলন ২০২৬:বাড়ছে প্রভাব, বিভক্ত স্বার্থ

৩৪ খলিলুর রহমানের হাতে জাতিসংঘের নেতৃত্ব, বাংলাদেশের প্রত্যাশা কতটা পূরণ হবে?

৩৭ যুদ্ধাপরাধীরা যখন নায়ক হয়ে ওঠে

৪২ বঙ্গোপসাগরের নীল জলসীমা: ২০১৪-এর রায় ও বাংলাদেশের হারানো অধিকার

হিমালয়ে হিমবাহ গলন, বন্যা বিপর্যয়, ভূ-রাজনীতি ও আন্তঃসীমান্ত নদী সংকট পৃ. ২৮

আল-উম্মাহ, একটি মাসিক জার্নাল, বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত ইসলামিক সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন থেকে প্রকাশিত হয়। এটি ইংরেজি, আরবি, বাংলা এবং তুর্কি ভাষায় পাওয়া যায়। প্রিয় লেখকবৃন্দ, আপনারা সমসাময়িক বিষয়াবলী, ইসলামী বিজ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা, ইতিহাস, এবং জননীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন। আমরা ইংরেজি, আরবি, বাংলা এবং তুর্কি ভাষায় ১৩০০ শব্দের অনধিক মৌলিক ও পরিচ্ছন্নভাবে লিখিত প্রবন্ধকে স্বাগত জানাই। প্রবন্ধ পাঠানোর ঠিকানা:

info@al-ummah.org

www.al-ummah.org

مؤسسة الأمة

AL-UMMAH FOUNDATION

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ডকুমেন্টেশনস (বিআইসিআরডি)

ঢাকা, বাংলাদেশ

মূল্য : ১০০ টাকা

সন্ধিক্ষণে উপসাগরীয় অঞ্চল পৃ. ১২

৪৯ ডিজিটাল যুগে শিশুদের সুরক্ষা: কম বয়সীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধের প্রস্তাব

৫২ অধ্যাপক ইসমাইল রাজি আল-ফারুকী: প্রত্যাখ্যানের চিঠিকেও যিনি মানবিক রূপ দিয়েছিলেন

৫৬ ডিজিটাল ক্যাশ: ব্যবসার জন্য নিরাপদ ও সুবিধাজনক পেমেন্ট ব্যবস্থা

৬০ অধ্যাপক শাহজাহান খান 'অর্ডার অব অস্ট্রেলিয়া' পদকে ভূষিত

৬৩ বিশ্ব মানচিত্রে আফ্রিকার অবস্থান সংশোধন: জাতিসংঘের প্রস্তাব পাস, বিরোধিতা যুক্তরাষ্ট্রের

৬৬ ডিজিটাল বিভ্রান্তির তাত্ত্বিক ভিত্তি

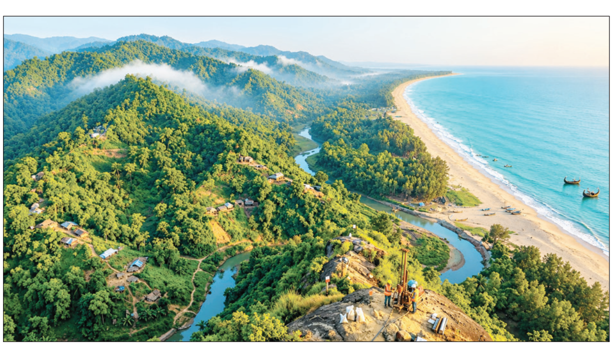

পাহাড় থেকে সমুদ্র: পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে রেয়ার আর্থের অদৃশ্য ভাণ্ডার পৃ. ৭০

প্রতিবেদক

মোহাম্মদ নাসির জাভেদ

ইসাম শেহাদাত

লে. কর্নেল (অব.) দিদার

ড. শাহজাহান খান OAM

ড. জহিরুল হক

গোলাম নবী ফাই, পিএইচডি

মো: মশিউর রহমান

মাসুমুর রহমান খলিলী

আল-উম্মাহ প্রতিবেদন

লেখকদের প্রকাশিত মতামত তাদের নিজস্ব। প্রকাশক এর জন্য কোনো দায়ভার গ্রহণ করে না।

পাঠকেরা এই জার্নালের বিষয়বস্তু ব্যবহার, পুনর্মুদ্রণ বা পুনরায় প্রকাশ করতে পারবেন; তবে শর্ত থাকে যে এর জন্য আমাদের কাছ থেকে পূর্বানুমতি নিতে হবে এবং আমাদের ওয়েবসাইটের একটি লিঙ্ক যুক্ত করতে হবে।

তুরস্কের ইস্তাম্বুলে এক বৈঠকের সময় আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ জাকির হোসেন (বামে) এবং টার্কিশ মারিফ ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আহমেত এমরে বিলগিলি। ছবি : আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশন

তুরস্কের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতার নতুন সম্ভাবনা

আল-উম্মাহ প্রতিবেদন

শিক্ষা, গবেষণা ও গণমাধ্যম খাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নতুন সম্ভাবনা উন্মোচনে তুরস্কের শীর্ষস্থানীয় দুটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কৌশলগত বৈঠক করেছেন আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও আল-উম্মাহর প্রধান সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসেন। সম্প্রতি দেশটির ইস্তাম্বুল শহরে এসব পৃথক দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ইস্তাম্বুলে অবস্থিত তুর্কি মারিফ ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি বোর্ডের ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আহমেদ এমরে বেলগিনির সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার সার্বিক দিক নিয়ে আলোচনা হয়। কীভাবে এই

আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ জাকির হুসাইন (ডানে), ইস্তাম্বুলের ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার (ISAM)-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াশার চোলাকের (বামে) সঙ্গে। ছবি : আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশন

সম্পর্ককে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারত্বে রূপ দেওয়া যায়, তা নিয়ে তারা বিস্তর মতবিনিময় করেন।

বৈঠকে অধ্যাপক ড. বেলগিনি শিক্ষাক্ষেত্রে আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কাজের বিষয়ে দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং সম্ভাব্য কিছু যৌথ উদ্যোগের প্রস্তাব তুলে ধরেন। এতে দক্ষতা বিনিময়, যৌথ প্রাতিষ্ঠানিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের উপায় প্রাধান্য পায়। উল্লেখ্য, বিশ্বজুড়ে শিক্ষা খাতে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে তুর্কি মারিফ ফাউন্ডেশন; অন্যদিকে আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশভিত্তিক একটি নবগঠিত প্ল্যাটফর্ম।

অন্য এক বৈঠকে আল-উম্মাহ চেয়ারম্যান সাক্ষাৎ করেন সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজের (আইএসএএম) ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. ইয়াশার কুলাকের সঙ্গে। আইএসএএম হলো তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের ধর্মবিষয়ক প্রেসিডেন্সি (দিয়ানেত)-এর অধীনে পরিচালিত একটি স্বনামধন্য বিশ্বস্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

এ বৈঠকে মূলত আধুনিক গণমাধ্যম পরিচালনা, গবেষণা সম্প্রসারণ ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি বিনিময়ে যৌথ কাজের সম্ভাবনাগুলো খতিয়ে দেখা হয়। উভয় পক্ষ কৌশলগত সহযোগিতা এবং যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়নে ইতিবাচক আগ্রহ প্রকাশ করে।

তুরস্ক সফর ও বৈঠক প্রসঙ্গে মোহাম্মদ জাকির হোসেন বলেন, বাংলাদেশ ও তুরস্কের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি গঠনমূলক ও কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা তৈরি করা প্রয়োজন। দ্বিপক্ষীয় জ্ঞান বিনিময় এবং যুগপৎ উদ্যোগের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ■

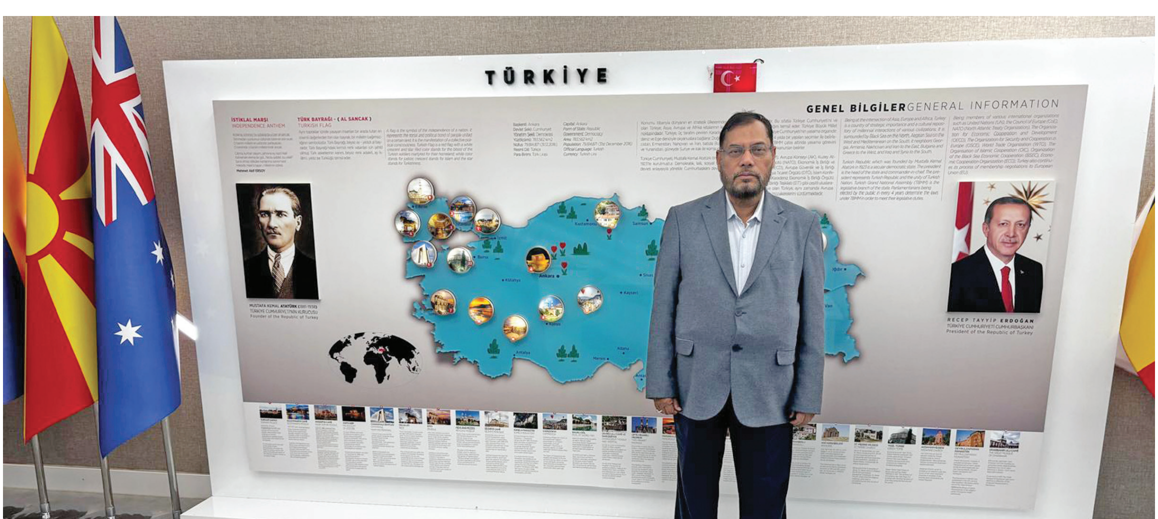

ইস্তাম্বুলের সাবাহাত্তিন জাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে 'ইসলামিক প্রকাশনা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন'-এ অংশগ্রহণকারীদের একটি দলগত ছবি।

ইস্তাম্বুল সম্মেলনে বৈশ্বিক প্রকাশক প্ল্যাটফর্মের পরিকল্পনা

জাতীয় ও ভাষার সীমানা পেরিয়ে বই, অনুবাদ ও প্রকাশনা স্বত্ব পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারের উদ্যোগ

আল-উম্মাহ প্রতিবেদন

ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামি প্রকাশনা সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকাশকদের মধ্যে তথ্য, প্রকাশনা স্বত্ব, অনুবাদ, সম্ভাব্য অংশীদার, প্রশিক্ষণ ও বাজারসংক্রান্ত তথ্য বিনিময়ের জন্য একটি যৌথ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বইমেলায় যৌথ অংশগ্রহণ, অনুবাদ ও সহ-প্রকাশনা, সীমান্ত পেরিয়ে বই বিতরণ এবং প্রকাশনা খাতের পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ইস্তাম্বুলের ইস্তাম্বুল সাবাহাত্তিন জাইম ইউনিভার্সিটির বাইরে 'ইসলামি প্রকাশনা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন'-এ আলোচনার টেবিলে অংশগ্রহণকারীরা

২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর ইস্তাম্বুল সাবাহাত্তিন জায়েম বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক ইসলামি বই প্রকাশক ইউনিয়নের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী এ সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকাশনা খাতের পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

সম্মেলনে বই, অনুবাদ ও প্রকাশনা স্বত্বকে ভাষা ও জাতীয় সীমানা পেরিয়ে বিশ্বের পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। প্রকাশকদের মধ্যে পেশাগত যোগাযোগ বৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র তৈরির বিষয়ও গুরুত্ব পায়।

সম্মেলনটি আন্তর্জাতিক ইসলামি বই প্রকাশক ইউনিয়নের প্রথম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয়। তুরস্কের ধর্মীয় বিষয়ক অধিদপ্তর, সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং তুর্কি সহযোগিতা ও সমন্বয় সংস্থা এতে সহযোগিতা করে।

ইউনিয়নের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরুর পর সংগঠনটির সদস্যসংখ্যা ৬৮টি দেশের ২০০-এর বেশি প্রকাশনায় পৌঁছেছে।

সম্মেলনে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও বহুভাষিক মাসিক 'আল-উম্মাহ'-এর প্রধান সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসাইন। এছাড়া বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থটের (বিআইআইটি) মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ আব্দুল আজিজসহ বিভিন্ন দেশের প্রকাশক, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের অংশগ্রহণ সম্মেলনটিকে আন্তর্জাতিক পরিসরে আরও বৈচিত্র্যময় করে তোলে।

২০২১ সালের উদ্যোগ থেকে বৈশ্বিক ইউনিয়ন

আন্তর্জাতিক ইসলামি বই প্রকাশক ইউনিয়নের উদ্যোগের সূত্রপাত ২০২১ সালে ইস্তাম্বুলে। সে সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকাশকরা ইসলামি বই প্রকাশনা খাতে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার পথ খুঁজতে একত্রিত হন। সেই উদ্যোগকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ও পেশাজীবীদের মধ্যে ধারাবাহিক যোগাযোগ ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে একটি বৃহত্তর সহযোগিতামূলক আন্দোলনের বিকাশ ঘটে, যা 'গ্রেট ভিশন মুভমেন্ট' নামে পরিচিতি পায়।

প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ভারত, জর্ডান, মিসর, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রকাশনা সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীরা যুক্ত হন। তাদের অভিন্ন লক্ষ্য ছিল—দেশ, ভাষা ও বাজারের সীমা অতিক্রম করে ইসলামি বই, জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যকে আরও বিস্তৃত পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

প্রায় পাঁচ বছর ধরে পরামর্শ, যোগাযোগ ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের পর চলতি বছরের জানুয়ারিতে ইস্তাম্বুলে সদর দপ্তর স্থাপন করে ইউনিয়নটি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে।

IUIBP কি?

এই প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হলো ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব ইসলামিক বুক পাবলিশার্স বা আইইউআইবিপি (IUIBP)। এটি বিশ্বজুড়ে ইসলামি বই প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত প্রকাশনা সংস্থা, পেশাজীবী, প্রকাশনা স্বত্ব ব্যবস্থাপক ও অনুবাদকদের একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম। ইউনিয়নটির সদর দপ্তর ইস্তাম্বুলে অবস্থিত।

ইউনিয়নের লক্ষ্য হলো ইসলামি প্রকাশনায় বৈশ্বিক সহযোগিতা জোরদার করা, কপিরাইট ও অনুবাদ প্রকল্পে সহযোগিতা করা, পেশাগত মান উন্নত করা এবং ইসলামি চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের বইগুলোকে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা ও বাজারে পৌঁছে দেওয়া।

এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রকাশনা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রতিষ্ঠাতা পর্ষদ গঠন করা হয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরুর পর ইউনিয়নটির সদস্যসংখ্যা ৬৮টি দেশের ২০০-এর বেশি প্রকাশনায় পৌঁছেছে বলে সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্ল্যাটফর্ম

সম্মেলন সম্পর্কে মোহাম্মদ জাকির হোসাইন বলেন, ইসলামি প্রকাশনা দীর্ঘদিন ধরে সমন্বয়ের অভাবে ভুগেছে। বিশ্বের এক প্রান্তে তৈরি হওয়া মূল্যবান বই ও চিন্তাভাবনা ভাষাগত, বাণিজ্যিক বা বিতরণসংক্রান্ত বাধার কারণে অনেক সময় অন্য প্রান্তের পাঠকদের কাছে পৌঁছায় না।

তিনি বলেন, ইস্তাম্বুল সম্মেলন প্রকাশকদের সরাসরি যুক্ত করা এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে এই ব্যবধান দূর করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, সম্মেলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এর বৈচিত্র্য। বিভিন্ন দেশের প্রকাশকরা নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি বিভিন্ন বাজারের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে জানতে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাস্তব ফলাফল আনতে পারে, তা চিহ্নিত করার সুযোগ পেয়েছেন।

মোহাম্মদ জাকির হোসাইন বলেন, 'আমি মনে করি ইস্তাম্বুল শুভ সূচনা করেছে। এটি বিশ্বজুড়ে ইসলামি প্রকাশনার জন্য একটি দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্ল্যাটফর্ম। এখানে আমরা যে প্রচেষ্টা চালিয়েছি, তা যদি অব্যাহত থাকে, তবে এই সম্মেলনটি কেবল আরেকটি আন্তর্জাতিক সমাবেশ হিসেবে নয়; বরং আরও সুসংহত, পেশাদার ও বৈশ্বিকভাবে সম্পৃক্ত প্রকাশনা সম্প্রদায় গড়ে তোলার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

যৌথ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও তথ্যভান্ডার

সম্মেলনে ডিজিটাল প্রকাশনা, অনুবাদ, প্রশিক্ষণ, প্রকাশনা স্বত্ব, বইমেলা এবং শিল্পসংক্রান্ত তথ্য নিয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি সদস্য প্রকাশকদের

তথ্য, তাদের প্রকাশনার ক্ষেত্র, ভাষা, স্বত্ব এবং সম্ভাব্য সহযোগিতার সুযোগ নিয়ে একটি যৌথ তথ্যভান্ডার তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে।

প্রকাশনা খাতের বাজারপ্রবণতা, চ্যালেঞ্জ, অনুবাদ, বিতরণ, ডিজিটাল রূপান্তর ও স্বত্বসংক্রান্ত বিষয়ে পর্যায়ক্রমিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য 'ইসলামি প্রকাশনা পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র' গড়ে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে।

সম্মেলনে যৌথ অনুবাদ ও সহ-প্রকাশনা প্রকল্প, আন্তর্জাতিক বইমেলায় যৌথ প্যাভিলিয়ন, সীমান্ত পেরিয়ে বই বিতরণব্যবস্থা এবং গ্রন্থচৌর্যবৃত্তির বিরুদ্ধে সমন্বিত পদক্ষেপ নিয়েও আলোচনা হয়।

এ ছাড়া বইয়ের সূচীকরণ ও অনুবাদে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারকে সমর্থন করা হলেও লেখকদের অধিকার, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি ও প্রকাশিত কাজের মৌলিকত্ব রক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ইস্তাম্বুল ঘোষণা

সম্মেলনের অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক ইসলামি বই প্রকাশক ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সম্মেলন থেকে 'ইসলামি বই প্রকাশকদের মধ্যে সহযোগিতার জন্য ইস্তাম্বুল ঘোষণা' প্রকাশ করা হয়।

ঘোষণায় বইকে জ্ঞান, মানবসচেতনতা, সর্বজনীন মূল্যবোধ এবং বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির মধ্যে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ইসলামি বইকে সংলাপ ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার একটি সেতু এবং ইসলাম ও এর মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সুষম ও গঠনমূলক ধারণা তুলে ধরার মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

ঘোষণায় প্রকাশনার দায়িত্বশীল স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষা এবং গ্রন্থচৌর্যবৃত্তি প্রতিরোধের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

লেখক, প্রকাশক, অনুবাদক, চিত্রশিল্পীসহ বই প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত পেশাজীবীদের অধিকার সুরক্ষাকে টেকসই প্রকাশনা শিল্পের জন্য অপরিহার্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একই সঙ্গে কপিরাইট লঙ্ঘন ও বেআইনি ব্যবহার প্রতিরোধে সদস্যদের মধ্যে তথ্য বিনিময় ও সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

অনুবাদ ও বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশ

ইস্তাম্বুল ঘোষণায় অনুবাদকে বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের গুরুত্বপূর্ণ সেতু হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উচ্চমানের অনুবাদ, সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিভাষা, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রতি সংবেদনশীলতা এবং অনুবাদক ও সম্পাদকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালুর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বইমেলা ও প্রকাশনা বাজারে ইসলামি বইয়ের উপস্থিতি বাড়ানো এবং বিশ্বের পাঠক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান,

> এই সম্মেলনের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল এর বৈচিত্র্য। বিভিন্ন দেশের প্রকাশকরা তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পেরেছেন, বিভিন্ন বাজারের চ্যালেঞ্জগুলো বুঝতে পেরেছেন এবং যে ক্ষেত্রগুলোতে সহযোগিতা বাস্তব ফলাফল আনতে পারে তা চিহ্নিত করতে পেরেছেন।

গ্রন্থাগার, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা কেন্দ্রের কাছে এসব বইয়ের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার কথাও ঘোষণায় বলা হয়েছে।

সদস্য প্রকাশকদের বহুভাষিক পেশাদার তালিকা তৈরি, সম্পাদনা, নকশা, উৎপাদন ও বিপণনের মান উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক বিতরণ ও প্রকাশনা স্বত্ব ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধির আহ্বান জানানো হয়েছে।

ডিজিটাল প্রকাশনা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

ঘোষণায় প্রকাশনা খাতের ডিজিটাল রূপান্তরকে কৌশলগত প্রয়োজন হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। মুদ্রিত বইয়ের পাশাপাশি ই-বুক, শ্রুতিবই, শিক্ষামূলক প্ল্যাটফর্ম, তথ্যভান্ডার, মিথস্ক্রিয়ামূলক বিষয়বস্তু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সহজলভ্য প্রকাশনা ব্যবস্থার বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সম্পাদনা, সূচীকরণ, তথ্যবিন্যাস, সহায়ক অনুবাদ, বিপণন ও তথ্য বিশ্লেষণের মতো ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাব্য ব্যবহারের কথা বলা হলেও প্রযুক্তি ব্যবহারে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকার, স্বচ্ছতা ও নৈতিক মানদ- বজায় রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

তরুণ ও উদীয়মান প্রকাশকদের সহায়তা

প্রকাশনা শিল্পের ভবিষ্যৎ টেকসই করতে নতুন প্রজন্মের প্রকাশক, ছোট ও মাঝারি আকারের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান

এবং উদীয়মান বাজারে কাজ করা প্রকাশকদের সহায়তার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।

এ জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন, পরামর্শমূলক কর্মসূচি, যোগাযোগ ও অংশীদারত্বের সুযোগ এবং প্রকাশনা স্বত্ব, বিতরণ, বিপণন, ডিজিটাল প্রকাশনা ও আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রয়েছে।

যৌথ বইমেলা ও বিতরণ উদ্যোগ

আন্তর্জাতিক বইমেলায় যৌথ প্যাভিলিয়ন স্থাপন, প্রকাশক ও পরিবেশকদের মধ্যে পেশাগত যোগাযোগ এবং পরিবহন, গুদামজাতকরণ, বিতরণ ও ডিজিটাল বিপণনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

একই সঙ্গে জাতীয় আইন এবং লেখক ও প্রকাশকদের অধিকারকে সম্মান রেখে সীমান্ত পেরিয়ে ইসলামি বইয়ের চলাচল ও বিতরণ সহজ করতে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ও সহযোগিতামূলক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

ইস্তাম্বুল সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক ইসলামি প্রকাশনা ও জ্ঞানচর্চার পরিসরে দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পৃক্ততার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে উঠে আসে।

বাংলাদেশ থেকে আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও বহুভাষিক মাসিক 'আল-উম্মাহ'-এর প্রধান সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসাইন এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থটের (বিআইআইটি) মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ অংশ নেন।

বিভিন্ন দেশের প্রকাশক, শিক্ষাবিদ, গবেষক ও পেশাজীবীদের সঙ্গে একই প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ইসলামি জ্ঞান, গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মতবিনিময় এবং ভবিষ্যৎ সহযোগিতার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

তিন বছরের কর্মপরিকল্পনা

সম্মেলনে ইউনিয়নের আগামী তিন বছরের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনার ভিত্তি নির্ধারণ করা হয়। এতে সদস্যপদ সম্প্রসারণ, প্রকাশনা স্বত্ব, অনুবাদ, প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল প্রকাশনা, বইমেলা ও শিল্পসংক্রান্ত তথ্য নিয়ে বিশেষায়িত কমিটি গঠন, নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু এবং প্রকাশকদের পেশাদার তথ্যভান্ডার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে।

পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বইমেলা, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারত্ব, অনুবাদ, বিতরণ ও ডিজিটাল প্রকাশনায় যৌথ উদ্যোগ এবং ইসলামি প্রকাশনা শিল্পের অবস্থা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে পর্যায়ক্রমিক প্রতিবেদন প্রকাশের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

তিন দিনের সম্মেলনের কর্মসূচি

২৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ইস্তাম্বুল সাবাহাত্তিন জায়েম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিবন্ধন ও স্বাগত পর্বের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। সকাল সাড়ে ৯টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত, পরিচিতিমূলক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন ও প্রটোকল বক্তব্যের পর আন্তর্জাতিক ইসলামি বই প্রকাশক ইউনিয়নের পরিচিতি তুলে ধরা হয়।

সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে বিরতির পর বেলা ১১টা থেকে 'পরিবর্তনশীল বিশ্বে ইসলামি প্রকাশনা' শীর্ষক আন্তর্জাতিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক ড. মেহমেত বুলুতের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ অধিবেশনে ড. মুহাম্মদ আল-মুখতার আল-শানকিতি, অধ্যাপক ড. মেহমেত গোরমেজ এবং অধ্যাপক টিম উইন্টার (আবদাল হাকিম মুরাদ) বক্তব্য দেন।

জুমার নামাজ ও মধ্যাহ্নভোজের পর বেলা আড়াইটায় শুরু হয় বিষয়ভিত্তিক গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম পর্ব। বিকেল সাড়ে ৪টায় বিরতির পর দ্বিতীয় পর্বের গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসব বৈঠকে প্রকাশনা শিল্পের বিভিন্ন দিক, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, অনুবাদ, প্রকাশনা স্বত্ব, ডিজিটাল রূপান্তর, প্রশিক্ষণ, বইমেলা ও বিতরণব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়।

সন্ধ্যায় গোলটেবিলের চেয়ার ও সহ-চেয়াররা নিজ নিজ কমিশনের প্রতিবেদন চূড়ান্ত করেন। এরপর রাতের খাবার ও বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে জামাতে মাগরিবের নামাজের পর রাত ৮টায় রয়্যাল লরিয়েট অধ্যাপক তান শ্রী ড. সৈয়দ মুহাম্মদ নাকিব আল-আত্তাসের স্মরণে একটি স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তা ছিলেন সহযোগী অধ্যাপক ড. খাইরিল হুসাইনি। অনুষ্ঠানটি ইংরেজি ভাষায় অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে কোনো দোভাষী বা অনুবাদের ব্যবস্থা ছিল না।

২৬ সেপ্টেম্বর শনিবার দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচি শুরু হয় সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের মধ্য দিয়ে। সকাল ৯টা থেকে অনুষ্ঠিত এ অধিবেশনে কার্যক্রম প্রতিবেদন, আর্থিক প্রতিবেদন, বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা এবং পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিবেদন উপস্থাপন ও আগামী তিন বছরের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের অধিবেশন শুরু হয়। এতে বিভিন্ন কমিশনের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয় এবং ইউনিয়নের পরবর্তী তিন বছরের কর্মপরিকল্পনার ভিত্তি নির্ধারণ করা হয়।

দুপুর ১২টায় 'ইসলামি বই প্রকাশকদের মধ্যে সহযোগিতার জন্য ইস্তাম্বুল ঘোষণা' পাঠ ও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। এর পর অংশগ্রহণকারীদের দলগত ছবি তোলা ও মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়।

দুপুরের পর সম্মেলনের অংশগ্রহণকারীদের জন্য সাংস্কৃতিক ভ্রমণের আয়োজন করা হয়। বিকেল ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত তারা সুলায়মানিয়া পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাগার ও সুলায়মানিয়া মসজিদ পরিদর্শন করেন। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে বসফরাসে নৈশভোজ ও নৌভ্রমণের আয়োজন করা হয়। সেখানে

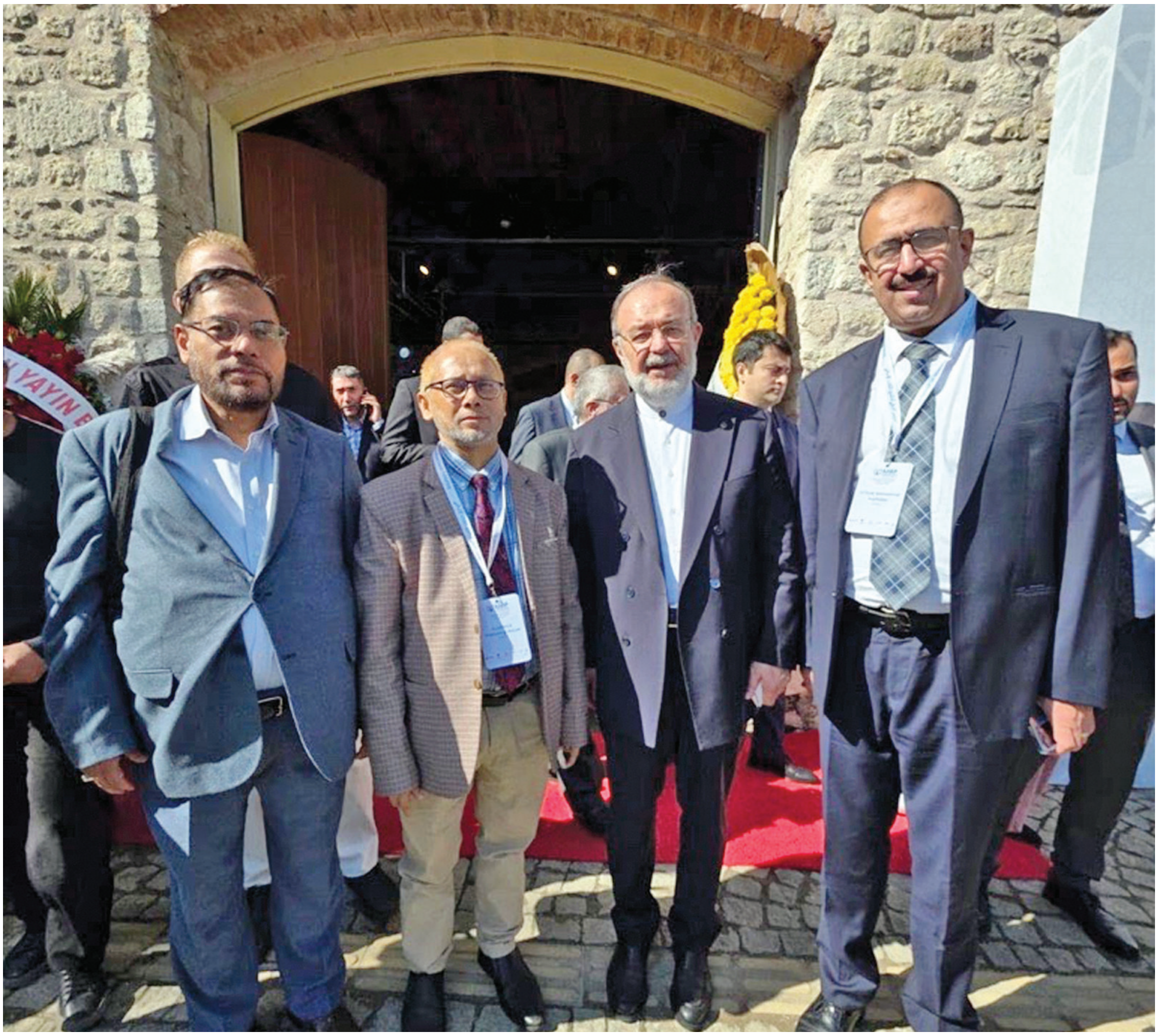

২৫-২৭ সেপ্টেম্বর ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত 'ইসলামি প্রকাশনা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন'-এ অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সাথে আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও আল-উম্মাহর প্রধান সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসেন (বামে)।

নবনির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের পরিচিতি, সদস্যপদ সনদ প্রদান এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও মতবিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়।

২৭ সেপ্টেম্বর রবিবার ছিল ঐচ্ছিক কর্মসূচির দিন। ভোর সাড়ে ৫টায় হোটেল থেকে অংশগ্রহণকারীরা ঐতিহাসিক উপদ্বীপের উদ্দেশে যাত্রা করেন। এরপর হায়া সোফিয়া গ্র্যান্ড মসজিদে ফজরের নামাজ আদায় এবং ঐতিহাসিক হায়া সোফিয়া চত্বরে প্রাতঃভ্রমণের আয়োজন করা হয়। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে হোটেলে ফিরে নাশতার পর অংশগ্রহণকারীদের বিমানবন্দরে স্থানান্তর এবং পরবর্তী সময় মুক্ত কর্মসূচির জন্য রাখা হয়।

প্রকাশনার নতুন সহযোগিতামূলক পরিসর

তিন দিনের সম্মেলনের আলোচনা, সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত, গোলটেবিল বৈঠক, ইস্তাম্বুল ঘোষণা এবং আগামী তিন বছরের কর্মপরিকল্পনার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক ইসলামি বই প্রকাশনার জন্য একটি সমন্বিত সহযোগিতামূলক কাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা আন্তর্জাতিক ইসলামি বই প্রকাশক ইউনিয়নকে একটি কার্যকর, পেশাদার, উন্মুক্ত ও দূরদর্শী আন্তর্জাতিক কাঠামো হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেন। একই সঙ্গে ইসলামি বইয়ের বৈশ্বিক উপস্থিতি জোরদার, সদস্যদের বৈধ অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা এবং জ্ঞান, সংলাপ ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রসারে প্রকাশনা খাতের ভূমিকা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়।

ইস্তাম্বুলে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে প্রতিষ্ঠাতা সম্মেলনের সমাপনীতে গৃহীত 'ইসলামি বই প্রকাশকদের মধ্যে সহযোগিতার জন্য ইস্তাম্বুল ঘোষণা' সেই উদ্যোগের একটি আনুষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরি করেছে। আর যৌথ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, প্রকাশনা স্বত্ব ও অনুবাদ সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক বইমেলায় যৌথ অংশগ্রহণ, সীমান্ত পেরিয়ে বই বিতরণ, প্রশিক্ষণ এবং প্রকাশনা শিল্পের তথ্যভান্ডার তৈরির পরিকল্পনা সামনে রেখে ইউনিয়নটি আগামী দিনে বৈশ্বিক ইসলামি প্রকাশনা সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও কার্যকর যোগাযোগ ও সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরির লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। ■

সন্ধিক্ষণে উপসাগরীয় অঞ্চল

মোহাম্মদ নাসির জাভেদ

প্রবীণ সাংবাদিক ও 'ইয়ারবুক অব দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড' এবং আরব নিউজ-এর সাবেক সম্পাদক, সৌদি আরব

ঐতিহ্যগত মার্কিন নিরাপত্তা-নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা মেনে নেওয়ার সময় এসেছে সৌদি আরবের। নিজের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বাড়ানো এবং একটি স্বাধীন ও বহুমুখী নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই অঞ্চলটিতে রিয়াদের ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব নির্ভর করছে।

একবিংশ শতাব্দীর ভূরাজনীতি এক চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকাজুড়ে যুদ্ধ ও সংঘাত ছড়িয়ে পড়ছে, যার প্রতিটিতেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপস্থিতি স্পষ্ট। জলবায়ু পরিবর্তন, পানি ও খাদ্য সংকট এবং ক্রমবিকাশমান শরণার্থী সমস্যা এই অস্থিতিশীলতাকে আরও বহুমুখী করে তুলেছে।

এই সামগ্রিক পটভূমিতে গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সময় পার করছে উপসাগরীয় অঞ্চল। ইরানকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সংঘাতের আঁচ ছড়িয়ে পড়ছে পুরো অঞ্চলে। একই সময়ে ইয়েমেনে সক্রিয় হুতিদের নতুন কোনো সামরিক তৎপরতা আরেকটি যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি করতে পারে–যা সৌদি আরবের জন্য প্রত্যক্ষ হুমকির কারণ।

সৌদি আরব এই নতুন সংঘাতের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। দেশটির দক্ষিণ সীমান্তে শক্তিশালী হুতিদের উপস্থিতি একটি দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা ঝুঁকিতে রূপ নিয়েছে। গোষ্ঠীটির ক্রমবর্ধমান ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা সৌদি আরবের মূল শহর, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো এবং জ্বালানি কেন্দ্রগুলোর জন্য বড় ধরনের হুমকি।

হুতিদের পেছনে ইরানের দীর্ঘদিনের সমর্থন রিয়াদের দুশ্চিন্তার অন্যতম প্রধান কারণ। রিয়াদ আশঙ্কা করছে, হুতিদের সঙ্গে ওয়াশিংটনের কোনো আংশিক চুক্তি এই অঞ্চলে তেহরানের প্রভাবকে আরও পোক্ত করবে। বিশেষ করে কৌশলগত লোহিত সাগর অঞ্চলে হুতিদের সামরিক উপস্থিতি এখন ইরানের আঞ্চলিক কৌশলের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।

এই জটিলতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহ্যবাহী নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতির অনিশ্চয়তা। রিয়াদের দীর্ঘদিনের মিত্র ওয়াশিংটন কি সত্যিই সৌদি আরবের মূল নিরাপত্তা স্বার্থ রক্ষায় আগের মতো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ?—এই প্রশ্নটিই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক অবস্থান এই সংশয়কে আরও ঘনীভূত করেছে। হুতিদের বিরুদ্ধে সরাসরি সামরিক সহায়তা দেওয়ার বিষয়ে তিনি রিয়াদকে কোনো স্পষ্ট আশ্বাস দেননি; এমনকি ইয়েমেনের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকারকে সামরিক সহায়তার বিষয়েও তিনি নীরব থেকেছেন।

বরং মার্কিন কর্মকর্তারা ওমানে হুতি প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে কেবল মার্কিন ও ইসরাইলি জাহাজে হামলা না চালানোর নিশ্চয়তা অর্জন করেছেন। এতে সৌদি আরবের সামনে একটি কঠিন কিন্তু বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে—নিজ ভূখণ্ড ও ভৌগোলিক স্বার্থ রক্ষার একক দায়িত্ব এখন তাদের নিজেদের কাঁধেই।

এ পরিস্থিতি মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক নিরাপত্তা কাঠামোর প্রকৃতি নিয়ে মৌলিক প্রশ্ন তুলেছে: মার্কিন বলয় কি সত্যিই পুরো উপসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়, নাকি এর মূল অগ্রাধিকার কেবল ইসরাইলের সুরক্ষা? কয়েক দশকের তেল-পেট্রোডলার-নিরাপত্তা সমীকরণের দিকে তাকালে এই দ্বিমুখী নীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

বোঝা যায়।

সৌদি আরবের জন্য এটি নিঃসন্দেহে এক সন্ধিক্ষণ। এমন কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যা কেবল মার্কিন ও ইসরাইলি জাহাজকে সুরক্ষিত রাখে কিন্তু সৌদি জাহাজ, বন্দর ও জ্বালানি অবকাঠামোকে হামলার ঝুঁকিতে ফেলে—তাকে কোনোভাবেই 'আঞ্চলিক নিরাপত্তা' বলা যায় না। এটি মূলত মার্কিন সংকটের বোঝা রিয়াদের দিকে ঠেলে দেওয়ার একটি সুচতুর চেষ্টা।

বাছাইকৃত নিরাপত্তা বলয়

বহু বছর ধরে ওয়াশিংটন ও উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে একটি অলিখিত নিরাপত্তা চুক্তি কার্যকর ছিল। তবে ২০১৯ সালে সৌদি আরবের প্রধান তেল স্থাপনায় (আরামকো) হামলার পর মার্কিন নিষ্ক্রিয়তা এই ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিল।

উপসাগরীয় অঞ্চলে বিশাল মার্কিন সামরিক উপস্থিতি, আধুনিক অস্ত্র সরবরাহ এবং গোয়েন্দা সহযোগিতা সত্ত্বেও মার্কিন প্রতিশ্রুতির ওপর রিয়াদের আস্থা এখন নড়বড়ে।

বর্তমান মার্কিন কৌশল সেই পুরোনো সংশয়কেই পুনর্ব্যক্ত করছে। নিজস্ব বাহিনী, আন্তর্জাতিক নৌপথ এবং ইসরাইল সরাসরি আক্রান্ত হলে ওয়াশিংটন কঠোর জবাব দেয় ঠিকই; তবে সৌদি ভূখণ্ড বা অবকাঠামো আক্রান্ত হলে মার্কিন সাড়া কতটা কার্যকর হবে, তা অত্যন্ত অনিশ্চিত।

ইরানকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বাড়ার পর থেকেই সংঘাত এড়াতে ওয়াশিংটনকে সতর্ক করে আসছে উপসাগরীয় দেশগুলো। তাদের মূল আশঙ্কা, সরাসরি যুদ্ধে জড়াবে যুক্তরাষ্ট্র, অথচ ভৌগোলিক অবস্থান এবং আঞ্চলিক মার্কিন ঘাঁটির উপস্থিতির কারণে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে রিয়াদ বা আবুধাবি।

তেল শোধনাগার, বিমানবন্দর, বন্দর ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলোর ধ্বংসযজ্ঞ উপসাগরীয় অর্থনীতিকেই বিপর্যস্ত করবে। অর্থাৎ, যেসব সংঘাত তাদের তৈরি নয়, তার পুরো মাশুল গুণতে হচ্ছে এই দেশগুলোকে।

এই অবস্থায় উপসাগরীয় দেশগুলো দুটি সমান্তরাল নীতি বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে: একদিকে ওয়াশিংটনের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমানো এবং অন্যদিকে তেহরানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে আঞ্চলিক ঝুঁকি সীমিত রাখা।

ইরান ও হুতি সমীকরণ

ইরানের আঞ্চলিক প্রক্সি কৌশল তেহরানকে সরাসরি যুদ্ধে না জড়িয়েও প্রতিপক্ষের ওপর চাপ বজায় রাখার সুযোগ দেয়। এই নেটওয়ার্কের মধ্যে হুতিরা এখন সর্বাধিক সামরিক সক্ষমতাসম্পন্ন অংশীদার। বছরের পর বছর যুদ্ধ অভিজ্ঞতায় পুষ্ট এই গোষ্ঠীটির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন এবং ইয়েমেনের একটি বড় অঞ্চল।

তাদের ভৌগোলিক অবস্থান এই গুরুত্বকে বহু গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। বাব আল-মানদাব প্রণালি শুধু একটি সাধারণ নৌপথ নয়—এটি লোহিত সাগরকে এডেন উপসাগর ও ভারত মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহের একটি বিশাল অংশ প্রতিনিয়ত এই সংকীর্ণ প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত হয়।

সৌদি আরব তাদের রপ্তানির জন্য উপসাগর ও লোহিত সাগর—দুই নৌপথের ওপরই সমানভাবে নির্ভরশীল। একদিকে হরমুজ প্রণালিতে ইরানের প্রভাব এবং অন্যদিকে বাব আল-মানদাবে হুতিদের সম্ভাব্য অবরোধ—এই দুইয়ের সমন্বয়ে সৌদি রপ্তানি বাণিজ্য চরম ঝুঁকিতে পড়তে পারে। 'ইস্ট-ওয়েস্ট পাইপলাইনে' সাম্প্রতিক আক্রমণগুলো প্রমাণ করেছে কীভাবে একটি সীমিত সামরিক আঘাত দ্রুত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটে রূপ নিতে পারে।

মার্কিন নির্বাচনী রাজনীতির প্রভাব

মধ্যপ্রাচ্যের এই রূপান্তরকে বোঝার জন্য ওয়াশিংটন ও তেল আবিবের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ বোঝা জরুরি। ইসরাইলের নির্বাচন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন—উভয় দেশের অভ্যন্তরীণ রাজকীয় রাজনীতি তাদের বৈদেশিক নীতিকে প্রভাবিত করছে।

হুতিদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পৃথক কৌশলগত সমঝোতা ইসরাইলকেন্দ্রিক মার্কিন নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতির স্বরূপ উন্মোচন করেছে। এতে উপসাগরীয় মিত্রদের মধ্যে দেখা দিয়েছে গভীর অনিশ্চয়তা।

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প–উভয়েই নিজস্ব রাজনৈতিক চাপ সামলাতে ব্যস্ত। ট্রাম্পের জন্য ইয়েমেনে নতুন কোনো সামরিক ফ্রন্ট না খোলা একটি রাজনৈতিক জয়ের বিষয় হতে পারে। মার্কিন ভোটারদের কাছে তিনি এটি তুলে ধরতে চাচ্ছেন যে, নতুন কোনো প্রত্যক্ষ যুদ্ধে না জড়িয়েও তিনি মার্কিন জাহাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন।

তবে যে সিদ্ধান্ত ওয়াশিংটনের নির্বাচনী রাজনীতির জন্য সুবিধাজনক, তা রিয়াদের নিরাপত্তার জন্য চরম বিপজ্জনক। এতে একটি চরম বৈষম্য তৈরি হচ্ছে–ইসরাইলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি অঞ্চলটিতে ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা বাড়াচ্ছে, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি সরাসরি জড়িয়ে পড়া থেকে ওয়াশিংটনকে বিরত রাখছে। এর মাঝে পড়ে উপসাগরীয় দেশগুলোকে অপরের তৈরি সংকটের মাশুল গুণতে হচ্ছে।

সৌদি আরবের আগামী কৌশল

এই পরিস্থিতি সৌদি আরবের জন্য একটি চরম পরীক্ষা। ঐতিহ্যগত নিরাপত্তা-নির্ভরতা থেকে বের হয়ে এসে

রিয়াদকে এখন নতুন বাস্তবতা মেনে নিতে হবে।

অবশ্যই, রাতারাতি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্ভব বা যুক্তিযুক্ত নয়। মার্কিন গোয়েন্দা তথ্য, সামরিক প্রযুক্তি এবং আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার (Air Defense) বিকল্প তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি করা কঠিন। তবে কোনো নির্দিষ্ট মার্কিন প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক সম্পর্কের ওপর দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা টিকিয়ে রাখা যায় না।

অতএব, ওয়াশিংটনের সঙ্গে রিয়াদের নিরাপত্তা চুক্তির শর্তাবলি স্পষ্ট করা জরুরি। ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, সমুদ্রপথে হুমকি বা বিদেশী সশস্ত্র গোষ্ঠীর আক্রমণের মুখে যুক্তরাষ্ট্রের ঠিক কী ধরণের সামরিক ভূমিকা থাকবে—তার একটি লিখিত ও সুনির্দিষ্ট রূপরেখা থাকা দরকার।

এর পাশাপাশি, সৌদি আরবকে নিজের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে: ১. প্রতিরক্ষা খাত আধুনিকায়ন: সমন্বিত ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন-বিরোধী প্রযুক্তি, সাইবার নিরাপত্তা, ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার এবং দেশীয় প্রযুক্তিতে গোলাবারুদ উৎপাদনে জোর দেওয়া। ২. অংশীদারিত্বের বহুমুখীকরণ: জিসিসি (GCC) সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সমন্বিত আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা জোরদার করার পাশাপাশি পাকিস্তান, তুরস্ক, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, চীন ও মিসরের সঙ্গে কৌশলগত নিরাপত্তা সম্পর্ক গভীর করা। ৩. ইয়েমেন নীতির পুনর্মূল্যায়ন: ইয়েমেন সংকটে শুধু বিমান হামলার ওপর নির্ভর না করে একটি শক্ত রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাভিত্তিক অবস্থান নেওয়া। কোনো সমঝোতায় পৌঁছানোর আগে হুতিদের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতার ওপর আন্তর্জাতিক আইনি বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা। ৪. তেহরানের সঙ্গে সরাসরি সংলাপ: যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভর না করে ইরান ও সৌদি আরবের দ্বিপক্ষীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা (Hotline) সচল রাখা, যাতে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি এড়ানো যায় এবং আঞ্চলিক সংঘাত থেকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে দূরে রাখা যায়।

উপসংহার উপসাগরীয় অঞ্চলের ভূরাজনীতি এখন এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন অতিক্রম করছে। ওয়াশিংটন স্পষ্ট করে দিয়েছে—তারা নিজেদের সম্পদ এবং ইসরাইলের সুরক্ষাকেই প্রথম অগ্রাধিকার দেবে। এই সত্য সৌদি আরবসহ পুরো অঞ্চলের সামনে একটি স্পষ্ট বার্তা পৌঁছে দিয়েছে: ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের একটি স্বাধীন, শক্তিশালী এবং আত্মনির্ভরশীল নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিকল্প আর নেই। ■

তালেবান সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন তুর্কি গোয়েন্দা প্রধান ইব্রাহিম কালিন

কাবুল ও ইসলামাবাদে তুর্কি গোয়েন্দাপ্রধানের সফরের তাৎপর্য

আল-উম্মাহ বিশ্লেষণ

সারসংক্ষেপ: ইব্রাহিম কালানের জোড়া সফর মূলত দুটি ভিন্ন ভূরাজনৈতিক পথকে একসূত্রে যুক্ত করেছে–প্রথমটি দক্ষিণ এশীয় পথ (যার কেন্দ্রে আফগান-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব), এবং দ্বিতীয়টি মধ্যপ্রাচ্যের পথ (যা ইরানের বিরুদ্ধে চলমান সংঘাত থেকে শুরু করে সৌদি আরবের নিরাপত্তা ও লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত)।

তুর্কি জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ইব্রাহিম কালিন ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির

তুর্কি জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার (MIT) প্রধান ইব্রাহিম কালিনের সাম্প্রতিক আফগানিস্তান ও পাকিস্তান সফর কেবল সাধারণ কোনো আঞ্চলিক পর্যটনের অংশ নয়। এমন এক সময়ে তিনি এ সফরটি করলেন, যখন দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক নিরাপত্তা সংকট ক্রমেই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে।

তালেবান সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে কাবুল ও কান্দাহারে বৈঠকের পর কালিন ইসলামাবাদ যান। সেখানে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির এবং সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা (ISI)-র প্রধান আসিম মালিকের সঙ্গে বৈঠক করেন। পরবর্তীতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ তাকে অভ্যর্থনা জানান। তুর্কি নিরাপত্তা সূত্রের তথ্যমতে, এসব আলোচনায় দ্বিপক্ষীয় নিরাপত্তা সহযোগিতার পাশাপাশি আঞ্চলিক সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি ও সামগ্রিক ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি গুরুত্ব পায়।

১৫ সেপ্টেম্বর এক সামরিক মহড়াচলাকালে পাকিস্তানি একটি জাহাজের সঙ্গে ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজের বিপজ্জনক মুখোমুখি অবস্থানের ঘটনা ঘটে, যা পরবর্তীতে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক প্রতিবাদ বিনিময়ে রূপ নেয়। ইসলামাবাদের দাবি, ভারতীয় জাহাজটি পাকিস্তানের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের (EEZ) ভেতরে এসে উসকানিমূলক মহড়া চালিয়েছে। যদিও ভারত এই ঘটনার ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছে।

কালিনের সফরের টাইমিং বোঝার ক্ষেত্রে ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ। সামুদ্রিক এই উত্তেজনার মাত্র দুই দিন পরই তার ইসলামাবাদ সফর অনুষ্ঠিত হয়। একই সময়ে পাকিস্তান আফগান সীমান্তের নিরাপত্তা সংকট এবং মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিতিশীলতার তীব্র নেতিবাচক প্রভাব সামাল দিচ্ছিল। ফলে পাকিস্তানি নেতৃত্ব যে বহুমুখী ভূরাজনৈতিক চাপের মুখোমুখি, ঘটনাটি তারই প্রতিচ্ছবি।

ইসরাইল সংক্রান্ত ইস্যুটিও এসব আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যোগ করেছে। আফগান ও পাকিস্তানি—উভয় পক্ষের কর্মকর্তাদের সঙ্গেই যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল ও ইরানের মধ্যকার যুদ্ধ নিয়ে কালিনের কথা হয়েছে। তুর্কি সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছে, ইসলামাবাদের বৈঠকে যুদ্ধপরবর্তী মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তার ভারসাম্য, এর সম্ভাব্য রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রভাব এবং অন্যান্য অঞ্চলে সংঘাত বিস্তৃত হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ করা হয়।

পাকিস্তানি নিরাপত্তা বয়ানে প্রায়শই ভারত ও ইসরাইলকে এক সুতায় গাঁথা হয়। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা মুহাম্মদ আসিফ তার দেশের কৌশলগত হুমকির কথা বলতে গিয়ে ভারত ও ইসরাইলের সামরিক সহযোগিতার প্রসঙ্গ তোলেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি ভারত, আফগানিস্তান, ইরান ও ইসরাইলকে পাকিস্তানের ভূবেষ্টিত ঝুঁকির অংশ হিসেবে তুলে ধরেন।

তুরস্ক ও আফগানিস্তানের মধ্যে নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সহযোগিতার পাশাপাশি মানব পাচার, মাদক চোরাচালান এবং সন্ত্রাসবাদ দমনের মতো বিষয়গুলোও কালিনের কাবুল সংলাপে স্থান পেয়েছে।

এরপর ইসলামাবাদের আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু ঘুরে যায় আফগান সংকটের ওপর। সীমান্তে পাকিস্তানবিরোধী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে আফগান ভূখণ্ড ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে—এমন অভিযোগে তালেবান সরকারের ওপর দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষুব্ধ পাকিস্তান। কালিনের সফরের ঠিক আগের দিন জাতিসংঘে দাঁড়িয়ে ইসলামাবাদ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, আফগানিস্তানে উদ্ভূত সীমান্ত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জবাব দেওয়ার পূর্ণ অধিকার তাদের রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে কালিনের মধ্যস্থতার প্রধান উদ্দেশ্য কাবুল ও ইসলামাবাদের মধ্যে যোগাযোগের পথ খোলা রাখা। আঙ্কারা যেমন কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে দুই পক্ষের উত্তেজনা কমানোর প্রয়াস চালাচ্ছে, তেমনই পাকিস্তান জানিয়েছে যে আফগান ভূখণ্ড থেকে সশস্ত্র তৎপরতা বন্ধের শর্তে তারা যেকোনো বাইরের মধ্যস্থতাকে স্বাগত জানাবে।

তুরস্কের এই মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা আকস্মিক নয়। তুর্কি গোয়েন্দা সংস্থা এর আগেও পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের উত্তেজনা প্রশমনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি আঙ্কারা ও ইস্তাম্বুলে কাতারকে সঙ্গে নিয়ে যৌথ আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। কিছু আফগান গণমাধ্যমের দাবি, কাবুলে সাম্প্রতিক তুর্কি-কাতারি উদ্যোগটি পাকিস্তানের সরাসরি অনুরোধেই নেওয়া হয়েছে (যদিও তুর্কি বা পাকিস্তানি পক্ষ থেকে এর আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ মেলেনি)।

তবে আফগানিস্তান মূলত পাকিস্তানের সামগ্রিক নিরাপত্তার একটি অংশ মাত্র। ভারতের সঙ্গে নিত্য উত্তেজনা, ইরান-ইসরাইল সংঘাতের আঁচ এবং নিজের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি মিলিয়ে ইসলামাবাদকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হচ্ছে।

এখানেই সৌদি ফাইল এবং ঐতিহাসিক 'মক্কা চুক্তি' সমীকরণে যুক্ত হয়। কালিন পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে সৌদি আরব-হুতি উত্তেজনা এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ঝুঁকি নিয়ে কথা বলেন। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অবশ্য পুনর্ব্যক্ত করেছে যে, সৌদি আরবের সঙ্গে তাদের বিদ্যমান প্রতিরক্ষা চুক্তি বহাল রয়েছে। তবে লোহিত সাগর ও বাব আল-মানদাব সংকটের স্থায়ী সমাধান কূটনীতি ও সংলাপের মাধ্যমেই হওয়া উচিত।

এই কূটনৈতিক তৎপরতার মধ্যেই পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ স্পষ্ট করেছেন যে, সংঘাত চূড়ান্ত রূপ নিলে পাকিস্তান সৌদি আরবের পাশে দাঁড়াবে। অন্যদিকে পাকিস্তানি কর্মকর্তারা জানান, 'মক্কা চুক্তি' হলো পাকিস্তান, তুরস্ক ও সৌদি আরবের মধ্যকার ত্রিভুজীয় সমন্বয়ের যৌথ কাঠামো। প্রভাবশালী বৈশ্বিক গণমাধ্যম ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির ইরানকে হুতিদের আক্রমণ বন্ধ করার তাগিদ দিয়েছেন। তিনি সতর্ক করে দেন, চুক্তি অনুযায়ী রিয়াদ সহায়তা চাইলে ইসলামাবাদ সৌদি আরবকে রক্ষা করতে সামরিক পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে।

"পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ইরানকে সৌদি আরবে হুতি হামলা বন্ধে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।"

"সৌভাগ্যবশত, এই সমীকরণের প্রতিটি পক্ষের সঙ্গেই তুরস্কের সুদৃঢ় ও বিশ্বস্ত সম্পর্ক রয়েছে।"

অতএব, ইব্রাহিম কালিনের এই সফরের মূল গুরুত্ব এখানেই—এটি আপাতদৃষ্টিতে পৃথক দুটি ভূরাজনৈতিক পথকে মেলাতে পেরেছে। প্রথমটি দক্ষিণ এশীয় পথ (যা আফগান-পাকিস্তান সীমান্ত বিরোধ থেকে উদ্ভূত), আর দ্বিতীয়টি মধ্যপ্রাচ্যীয় পথ (যা ইরান-ইসরাইল সংঘাত থেকে শুরু করে সৌদি আরবের নিরাপত্তা ও লোহিত সাগরের নৌপথ রক্ষা পর্যন্ত বিস্তৃত)।

এই দুই ভূরাজনৈতিক ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে পাকিস্তান। তালেবান, ভারত, ইরান, সৌদি আরব ও তুরস্কের সঙ্গে একই সময়ে ভারসাম্য বজায় রেখে চলা ইসলামাবাদের জন্য মারাত্মক চ্যালেঞ্জের।

অন্যদিকে, তুরস্ক এখানে একটি বিরল সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। তালেবানদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ কাবুলের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দেয়, পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ গোয়েন্দা সম্পর্ক ইসলামাবাদের দুশ্চিন্তা বোঝার পথ তৈরি করে, আবার 'মক্কা চুক্তি' তাদের রিয়াদ ও ইসলামাবাদের সঙ্গে একই প্রতিরক্ষাবলয়ে রাখে।

ফলে এই মুহূর্তে আঙ্কারার ভূমিকা সরাসরি কোনো পক্ষে যোগ দেওয়া নয়; বরং সংকটের বিস্তার রোধ করা এবং যোগাযোগের পথগুলো সচল রাখা।

কৌশলগত দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী, কাবুল থেকে ইসলামাবাদ পর্যন্ত ইব্রাহিম কালিনের এই সফর কেবল একগুচ্ছ দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের বিষয় নয়। এটি মূলত পাকিস্তানের ওপর এসে পড়া আঞ্চলিক নিরাপত্তার এক বিশাল ও জটিল জালকে বোঝার এবং তা সামাল দেওয়ার আঙ্কারার একটি বড় ধরনের কূটনৈতিক উদ্যোগ। ■

ইসলামিক সলিডারিটি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (ISSA)-এর সভাপতি মহামান্য প্রিন্স আব্দুল আজিজ বিন তুর্কি আল-ফয়সালের সদয় আমন্ত্রণে, অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কো-অপারেশন (OIC)-এর সাধারণ সচিবালয় ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, শনিবার সংস্থাটির সাধারণ পরিষদের ১৫তম অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেছে।

শান্তি ও যুব ক্ষমতায়নে ক্রীড়ার ভূমিকার ওপর জোর ওআইসির

আল-উম্মাহ ডেস্ক

শান্তি প্রতিষ্ঠা, পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি এবং যুবসমাজকে ক্ষমতায়নে ক্রীড়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছে অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেশন (ওআইসি)।

গত ১২ সেপ্টেম্বর সৌদি আরবের তায়েফে ইসলামিক সলিডারিটি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের (আইএসএসএ) সাধারণ পরিষদের ১৫তম অধিবেশনে এ গুরুত্বারোপ করা হয়। এতে আইএসএসএর সদস্য দেশগুলোর জাতীয় অলিম্পিক কমিটির প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

International
Day of Peace

ISLAMIC
SOLIDARITY
SPORTS
ASSOCIATION

● বার্তায় ওআইসি ও আইএসএসএকে ধারাবাহিকভাবে সহযোগিতা ও সমর্থন দেওয়ার জন্য সৌদি আরব সরকারের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়, ক্রীড়া এখন আর শুধু প্রতিযোগিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এটি শান্তি, সংহতি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার একটি সার্বজনীন ভাষায় পরিণত হয়েছে।

ISLAMIC SOLIDARITY SPORTS ASSOCIATION

আইএসএসএর সভাপতি প্রিন্স আব্দুল আজিজ বিন তুর্কি আল-ফয়সালের আমন্ত্রণে অধিবেশনে অংশ নেয় ওআইসি। অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধনী বক্তব্য দেন প্রিন্স আব্দুল আজিজ বিন তুর্কি আল-ফয়সাল। পরে ওআইসির মহাসচিব এইচ. ই. ইসমাইল ওল্ড শেখ আহমেদের বিশেষ বার্তা পাঠ করে শোনানো হয়।

ওআইসির মানবিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিষয়ক সহকারী মহাসচিব রাষ্ট্রদূত ড. তারিক আলী বাখিত মহাসচিবের পক্ষে ওই বার্তা উপস্থাপন করেন।

বার্তায় ওআইসি ও আইএসএসএকে ধারাবাহিকভাবে সহযোগিতা ও সমর্থন দেওয়ার জন্য সৌদি আরব সরকারের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়, ক্রীড়া এখন আর শুধু প্রতিযোগিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এটি শান্তি, সংহতি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার একটি সার্বজনীন ভাষায় পরিণত হয়েছে।

ওআইসির অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার যুবসমাজকে ক্ষমতায়ন করা উল্লেখ করে বার্তায় বলা হয়, এ লক্ষ্য অর্জনে ক্রীড়া একটি কার্যকর ও কৌশলগত মাধ্যম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সভায় ইসলামিক সলিডারিটি গেমসের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের যুবসমাজকে ভ্রাতৃত্ব, সংহতি ও সুস্থ প্রতিযোগিতার চেতনায় একত্রিত করার ক্ষেত্রে আইএসএসএর অবদানের প্রশংসা করা হয়।

এদিকে এবারের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ২০২৬-২০২৯ মেয়াদের জন্য আইএসএসএর নতুন পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচিত হয়েছে। ওআইসি মনে করে, নতুন পর্ষদ গঠন সংস্থাটির কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার পাশাপাশি এর আগের অর্জনগুলোকে আরও এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

নতুন পরিচালনা পর্ষদের সক্ষমতার ওপর আস্থা প্রকাশ করে ওআইসি ভবিষ্যতে আইএসএসএর সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও জোরদার ও সম্প্রসারণের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। ■

ব্রিকস সম্মেলন ২০২৬: বাড়ছে প্রভাব, বিভক্ত স্বার্থ

নয়াদিল্লি সম্মেলনে সংস্কার, আর্থিক স্বায়ত্তশাসন ও বৈশ্বিক সহযোগিতার উচ্চাভিলাষ–কিন্তু অভিন্ন কৌশলের প্রশ্নে রয়ে গেছে সীমাবদ্ধতা

আল-উম্মাহ ডেস্ক

২০২৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ১৮তম ব্রিকস সম্মেলন উদীয়মান অর্থনীতিগুলোর জন্য অধিকতর প্রতিনিধিত্ব, আর্থিক স্বায়ত্তশাসন এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তায় বৃহত্তর সহযোগিতার দাবি জোরালো করেছে। সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত 'নয়াদিল্লি ঘোষণা'-য় জাতিসংঘ সংস্কার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, সন্ত্রাসবাদ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতসহ সমসাময়িক বৈশ্বিক রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে।

বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের প্রতিনিধিত্বকারী ব্রিকস এখন আর কেবল উদীয়মান অর্থনীতির একটি সহযোগিতা প্ল্যাটফর্ম নয়; বরং বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তারের সক্ষমতা অর্জনকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ জোট। সম্মিলিতভাবে ব্রিকস সদস্যরা বিশ্ব জিডিপির অন্তত

এক নজরে

- সম্মেলন: ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন
- স্থান: নয়াদিল্লি
- তারিখ: ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬
- মূল বার্তা: বহুমেরু বিশ্বব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও আর্থিক স্বায়ত্তশাসন
- গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র: জাতিসংঘ, আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, WTO, বাণিজ্য, পেমেন্ট ব্যবস্থা, AI, জ্বালানি ও নিরাপত্তা
- মূল দ্বন্দ্ব: অর্থনৈতিক স্বার্থের মিল থাকলেও সদস্যদের ভূরাজনৈতিক অগ্রাধিকার অভিন্ন নয়

৪০ শতাংশ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ২৬ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করছে।

কিন্তু এখানেই ব্রিকসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি সামনে আসে–অর্থনৈতিক শক্তি কি রাজনৈতিক ঐক্যে রূপ নিচ্ছে?

উত্তরটি এখনো সরল নয়। সদস্য দেশগুলোর ভূরাজনৈতিক স্বার্থ, নিরাপত্তা অগ্রাধিকার এবং পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের ধরন এক নয়। ফলে ব্রিকসের সম্প্রসারণ যেমন এর প্রভাব বাড়াচ্ছে, তেমনি বৃহত্তর জোটের মধ্যে ঐকমত্য তৈরি করাও কঠিন করে তুলছে।

সংস্কারের দাবি বনাম বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থা

ব্রিকসের নয়াদিল্লি ঘোষণায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে চীন ও রাশিয়ার স্থায়ী সদস্যপদ বহাল রাখার অবস্থানকে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি ব্রাজিল ও ভারতের অধিকতর ভূমিকার প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

একই সঙ্গে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকে উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলোর অর্থনৈতিক গুরুত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব ও ভোটাধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে। আইএমএফের ১৬তম কোটা পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নেরও আহ্বান জানানো হয়েছে।

বাণিজ্যক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কার্যকর বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করার আহ্বান এসেছে। একতরফা নিষেধাজ্ঞা এবং কার্বন বর্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট ব্যবস্থার বিরোধিতাও করা হয়েছে।

এই অবস্থানগুলো ব্রিকসের একটি মৌলিক উদ্বেগকে প্রকাশ

১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।

করে–বিশ্ব অর্থনীতির শক্তির ভারসাম্য বদলেছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামো সেই পরিবর্তনের সঙ্গে একই গতিতে বদলায়নি।

ডলারের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা কতদূর?

নয়াদিল্লি সম্মেলনের অন্যতম আলোচিত বিষয় ছিল আন্তর্জাতিক লেনদেনে মার্কিন ডলারের ওপর নির্ভরতা কমানো।

তবে ঘোষণাপত্রে ব্রিকসের জন্য কোনো অভিন্ন মুদ্রা চালুর প্রতিশ্রুতি নেই। বরং জাতীয় মুদ্রায় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানো এবং আন্তঃসীমান্ত পেমেন্ট ব্যবস্থায় সহযোগিতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ব্রিকস পেমেন্ট টাস্কফোর্সকে কাজ এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এখানে ঘোষণাপত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তববাদী দিক রয়েছে। ব্রিকস স্বীকার করেছে যে সব সদস্য দেশের জন্য একই ধরনের আর্থিক কাঠামো কার্যকর নাও হতে পারে।

অর্থাৎ, ডলার-নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্য অভিন্ন হলেও সেই লক্ষ্য অর্জনের পথ এখনো অভিন্ন নয়। এটি ব্রিকসের শক্তি ও সীমাবদ্ধতা–দুই দিকই তুলে ধরে।

মধ্যপ্রাচ্য: ঐকমত্যের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়েও সম্মেলনে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শনের পাশাপাশি বেসামরিক নাগরিক, পারমাণবিক স্থাপনা ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ফিলিস্তিন প্রশ্নে ২০২৫ সালের অক্টোবরের যুদ্ধবিরতি চুক্তির পরও গাজায় সহিংসতা অব্যাহত থাকা নিয়ে উদ্বেগ জানানো হয়েছে। ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির বিরোধিতা করে ১৯৬৭ সালের সীমান্তের ভিত্তিতে পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। জাতিসংঘে ফিলিস্তিনের পূর্ণ সদস্যপদের প্রতিও সমর্থন জানানো হয়েছে।

পেহেলগামে ২০২৫ সালের এপ্রিলের সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন নিহত হওয়ার ঘটনাও ঘোষণাপত্রে নিন্দা করা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদ, সন্ত্রাসী অর্থায়ন ও নিরাপদ আশ্রয়ের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারের আহ্বান জানানো হয়েছে। সুদান, সিরিয়া ও লেবাননের পরিস্থিতিও আলোচনায় এসেছে।

তবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের নাম সরাসরি উল্লেখ না করার

ব্রিকস বিজনেস ফোরামে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা।

বিষয়টি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এটি দেখায়, ব্রিকসের সদস্যদের মধ্যে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ইস্যুতে অভিন্ন অবস্থান তৈরি করা এখনো কঠিন।

এআই : নতুন সহযোগিতার ক্ষেত্র

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্রিকসের ভবিষ্যৎ সহযোগিতার একটি নতুন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে উঠে এসেছে।

সাইবার নিরাপত্তা, আন্তঃসীমান্ত ডিজিটাল অপরাধ মোকাবিলা এবং বৈশ্বিক এআই পরিচালনব্যবস্থা নিয়ে সহযোগিতার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

এখানে ব্রিকসের সামনে একই সঙ্গে দুটি সুযোগ রয়েছে। প্রথমত, প্রযুক্তি উন্নয়নে সদস্যদের সক্ষমতা সমন্বয় করা। দ্বিতীয়ত, এআই -এর বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রণ ও নীতিনির্ধারণে উন্নয়নশীল বিশ্বের বৃহত্তর ভূমিকা নিশ্চিত করা।

তবে এখানেও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ও জাতীয় স্বার্থের পার্থক্য ভবিষ্যৎ সহযোগিতার গতি নির্ধারণ করবে।

জ্বালানি নিরাপত্তা: অর্থনীতির সঙ্গে কৌশলগত স্বার্থ

জ্বালানি নিরাপত্তাও নয়াদিল্লি সম্মেলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্থিতিশীল জ্বালানি বাজার, নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর নিরাপত্তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সম্পদসমৃদ্ধ দেশগুলোর সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান রেখে গুরুত্বপূর্ণ খনিজের জন্য ন্যায্য ও স্থিতিস্থাপক সরবরাহব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এটি ব্রিকসের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কারণ জ্বালানি, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, প্রযুক্তি এবং সরবরাহ শৃঙ্খল এখন আর শুধু অর্থনৈতিক বিষয় নয়; এগুলো ক্রমেই ভূরাজনৈতিক শক্তির উপাদানে পরিণত হচ্ছে।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন: প্রভাব নাকি ঐক্য?

নয়াদিল্লি সম্মেলন ব্রিকসের ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষার একটি স্পষ্ট চিত্র দিয়েছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শাসনব্যবস্থায় সংস্কার, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে অধিকতর প্রতিনিধিত্ব এবং আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি এখন জোটটির নিয়মিত এজেন্ডার অংশ।

কিন্তু ঘোষণাপত্র একই সঙ্গে আরেকটি বাস্তবতাও সামনে এনেছে–ব্রিকসের অর্থনৈতিক ও জনমিতিক শক্তি যত দ্রুত বাড়ছে, রাজনৈতিক ঐকমত্য তত দ্রুত বাড়ছে না।

মধ্যপ্রাচ্য, ইউক্রেন, নিষেধাজ্ঞা, নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার প্রশ্নে সদস্যদের অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ফলে ব্রিকসকে একই সঙ্গে দুটি কাজ করতে হচ্ছে–বৃহত্তর বৈশ্বিক ভূমিকা দাবি করা এবং অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্যকে সামলে রাখা।

চীন ২০২৭ সালে জোটটির সভাপতিত্ব গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফলে পরবর্তী পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হবে–ব্রিকস কি তার ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শক্তিকে সমন্বিত নীতিগত পদক্ষেপে রূপ দিতে পারবে?

এর ভবিষ্যৎ গুরুত্ব শুধু সদস্যসংখ্যা কিংবা সম্মিলিত জিডিপির ওপর নির্ভর করবে না। বরং নির্ভর করবে–সদস্য দেশগুলো তাদের অভিন্ন আকাঙ্ক্ষাকে কতটা কার্যকর প্রতিষ্ঠান, বাস্তব আর্থিক অবকাঠামো এবং সমন্বিত আন্তর্জাতিক পদক্ষেপে রূপ দিতে পারে তার ওপর।

ব্রিকস তাই এখনো একটি সম্ভাবনার প্রকল্প–কিন্তু সেই সম্ভাবনার সামনে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা তার নিজের ভেতরের স্বার্থের বৈচিত্র্য। ■

হিমালয়ে হিমবাহ গলন, বন্যা বিপর্যয়, ভূ-রাজনীতি ও আন্তঃসীমান্ত নদী সংকট

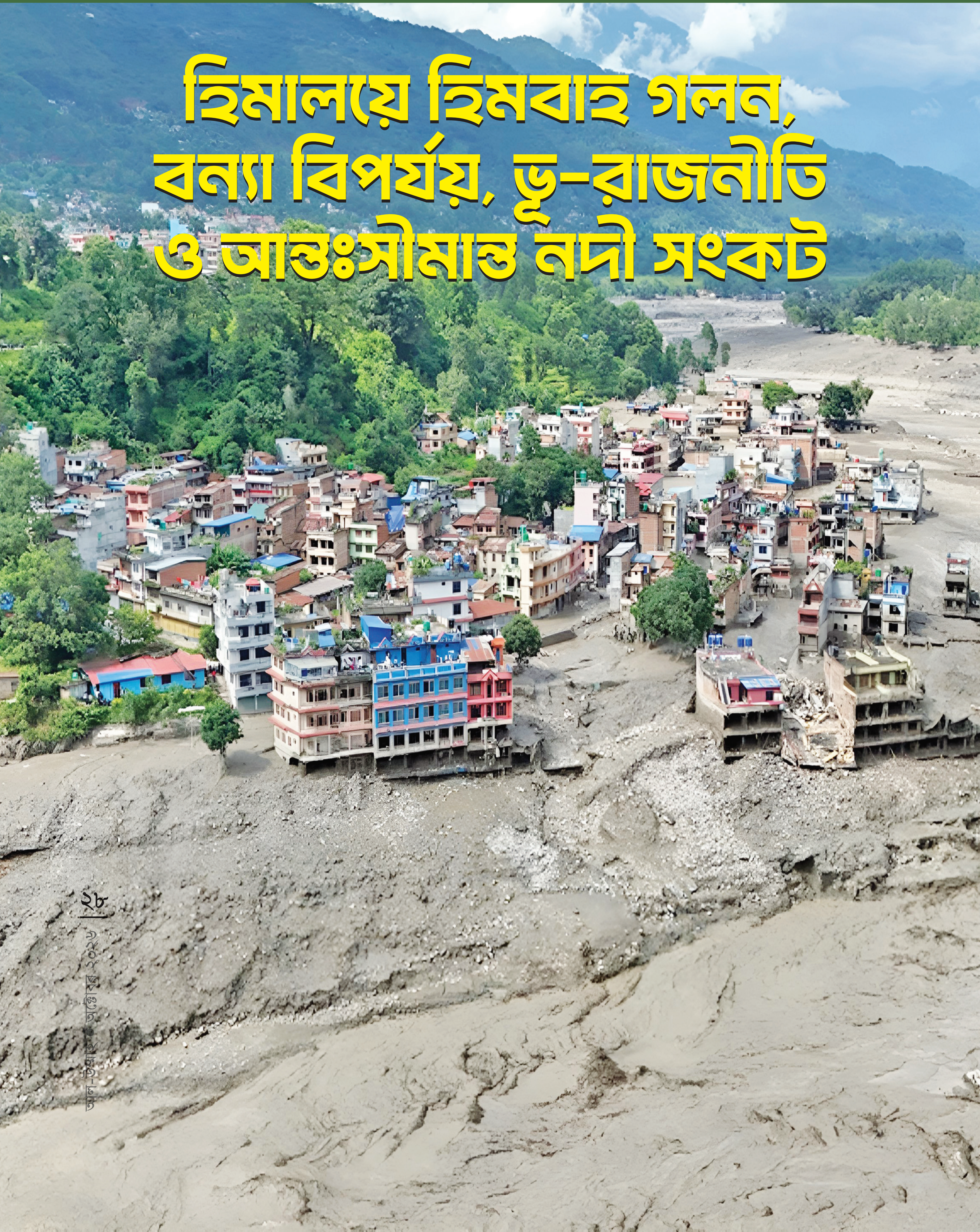

মাসুমুর রহমান খলিলী

সিনিয়র সাংবাদিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক

হিমালয়কে শুধু পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা হিসেবে দেখলে এর প্রকৃত গুরুত্ব বোঝা যাবে না। হিন্দুকুশ-হিমালয় অঞ্চল এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ পান-ভাণ্ডার। এই অঞ্চলের বরফ, তুষার ও হিমবাহ থেকে উৎপন্ন নদীগুলো গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, মেকং, সালউইনসহ এশিয়ার বহু গুরুত্বপূর্ণ নদীব্যবস্থাকে সচল রেখেছে। প্রায় দুই বিলিয়ন মানুষ কোনো না কোনোভাবে এই জলব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক পানি ও পর্বত উন্নয়ন কেন্দ্র (ICIMOD)-এর ২০২৬ সালের নতুন মূল্যায়ন বলছে, হিন্দুকুশ-হিমালয়ের হিমবাহের বরফ হারানোর হার ২০০০ সালের পর দ্বিগুণ হয়েছে এবং ১৯৭৫ সালের তুলনায় কিছু এলাকায় বরফের পুরুত্বের ক্ষতি ২৭ মিটার পর্যন্ত পৌঁছেছে।

অর্থাৎ হিমালয়ের সংকট আর কেবল পাহাড়ের চূড়ায় সীমাবদ্ধ কোনো পরিবেশগত পরিবর্তন নয়। এটি একই সঙ্গে পানি, খাদ্য, জ্বালানি, জনবসতি, অবকাঠামো এবং পরিশেষে ভূ-রাজনীতির একটি গভীর সংকট।

২০২৬ সালের ২৬ আগস্ট নেপাল-চীন সীমান্তবর্তী রসুয়া অঞ্চলে যে ভয়াবহ দুর্যোগ ঘটে, সেটিই এই নতুন বাস্তবতার একটি শক্তিশালী উদাহরণ। লাংটাং লিরুং এলাকার উচ্চভূমিতে বরফ ও শিলার বিশাল অংশ ধসে পড়ে লেন্দে নদী অববাহিকায় নেমে আসে। বিপুল ধ্বংসাবশেষ নদীর স্বাভাবিক প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে এবং পরবর্তীতে পানি, পলি, পাথর ও ধ্বংসাবশেষের ভয়াবহ স্রোত ভোটেকোশী ও ত্রিশূলী নদীব্যবস্থায় আছড়ে পড়ে। নেপালের ন্যাশনাল সোসাইটি ফর আর্থকোয়েক টেকনোলজি (NSET)-এর প্রাথমিক বিশ্লেষণ বলছে, এটি স্বাভাবিক মৌসুমি বন্যার তুলনায় অন্তত এক অর্ডার বা তারও বেশি মাত্রার একটি আকস্মিক ধ্বংসাবশেষ-বন্যা (debris flood) ছিল।

নেপাল সরকার ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১,২০৪টি লাশ উদ্ধারের কথা জানিয়েছিল এবং প্রায় ৪,২০০ মানুষ নিখোঁজ ছিল। পরবর্তী উদ্ধার অভিযানেও নিখোঁজের সংখ্যা কয়েক হাজারে ছিল। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে রয়টার্স জানায়, মৃতের সংখ্যা ১,৪০০ ছাড়িয়েছে এবং নিখোঁজ প্রায় ৫,৭০০। উদ্ধার অভিযান চলতে থাকায় এসব সংখ্যা আরও পরিবর্তিত হতে পারে।

এই দুর্যোগের মূল তাৎপর্য এখানেই যে, এটি প্রচলিত ‘বন্যা’ ধারণাকে অনেকটাই বদলে দিয়েছে।

হিমালয়ের বিপদ এখন ধারাবাহিক দুর্যোগের শৃঙ্খল

হিমালয় পৃথিবীর অন্যতম নবীন ও সক্রিয় ভূতাত্ত্বিক অঞ্চল। ভারতীয় ও ইউরেশীয় টেকটোনিক প্লেটের সংঘর্ষ এখানে এখনো অব্যাহত। ফলে ভূমিকম্প, ভূমিধস, শিলাধস এবং বরফধস এই অঞ্চলের স্বাভাবিক ভূ-প্রক্রিয়ার অংশ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন।

উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে হিমবাহগুলো পশ্চাদপসরণ করছে। হিমবাহের পেছনে ও পাশে নতুন হ্রদ তৈরি হচ্ছে, পুরনো হ্রদগুলো আকারে বড় হচ্ছে এবং মোরেইন বা বরফ-পাথর-মাটির প্রাকৃতিক বাঁধগুলো দুর্বল হয়ে পড়ছে। এসব হ্রদ ভেঙে সৃষ্টি হতে পারে জিএলওএফ বা হিমবাহ হ্রদ বিস্ফোরণ বন্যা (GLOF-Glacial Lake Outburst Flood)।

আইসিআইমোড (ICIMOD)-এর ২০২০ সালের বিস্তৃত সমীক্ষায় নেপাল, তিব্বত ও ভারতের কোশী, গণ্ডকী ও কার্নালী অববাহিকায় ৪৭টি সম্ভাব্য বিপজ্জনক হিমবাহ-হ্রদ শনাক্ত করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৪২টিই কোশী অববাহিকায়। যার ২৫টি ছিল চীনের তিব্বত অঞ্চলে, ২১টি নেপালে এবং একটি ভারতে। নেপালে ১৯৭৭ সাল থেকে ২৬টি GLOF নথিভুক্ত হয়েছে; যার ১১টির আন্তঃসীমান্ত প্রভাব ছিল।

তবে ২০২৬ সালের রসুয়া বিপর্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছে–হিমালয়ের বিপদকে কেবল এখঙঝ দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

২৬ আগস্টের ঘটনায় সরাসরি কোনো হিমবাহ-হ্রদ বিস্ফোরণের পরিবর্তে বরফ ও শিলার বিশাল ধস, তার সঙ্গে পলি ও পানি মিশে ধ্বংসাত্মক প্রবাহ এবং পরবর্তীতে আকস্মিক বন্যার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া দেখা গেছে। NSET-এর বিশ্লেষণেও ঘটনাটিকে বরফ-শিলার ধস (ice–rock avalanche) থেকে শুরু করে ধ্বংসাবশেষ প্রবাহ (debris flow) এবং পরবর্তীতে আকস্মিক বন্যার একটি ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া (cascading process) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এটি ভবিষ্যতের জন্য একটি বড় সতর্কবার্তা। কারণ কেবল GLOF-এর মতো নির্দিষ্ট হ্রদ পর্যবেক্ষণ করলেই সব বিপদ ধরা পড়বে না। পাহাড়ের ঢাল, বরফ, পারমাফ্রস্ট, শিলা, নদী এবং বৃষ্টিপাত–সবকিছুকে একই সুসংহত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে।

২০২৬-এর রসুয়া বিপর্যয়: নতুন হিমালয় বাস্তবতার আয়না

রসুয়া বিপর্যয়ের আরেকটি বিশেষ দিক হলো এর অভাবনীয় গতি। উচ্চভূমিতে ধস, নদী অবরুদ্ধ হওয়া এবং পরবর্তী প্রবাহ–সবকিছু এত দ্রুত ঘটেছিল যে অনেক জায়গায় মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার মতো পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়নি। নিচের দিকে নেমে আসা স্রোত কেবল পানি বহন করেনি; এর সঙ্গে ছিল বিশাল পরিমাণ পাথর, কাদা, বরফ, গাছপালা ও অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ। ফলে ক্ষতির ধরনও হয়েছে বহুমাত্রিক। রাস্তা ভেঙেছে, সেতু ভেসে গেছে, সীমান্ত অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বসতি নিশ্চিহ্ন হয়েছে এবং জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের টানেল ও স্থাপনা ধ্বংস হয়েছে। বহু মানুষ ভূগর্ভস্থ টানেলে আটকা পড়েছিলেন। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত উদ্ধারকারী দলকে ধ্বংসস্তূপ ও টানেলের ভেতর দীর্ঘ ও ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান চালাতে হয়েছে। অর্থাৎ হিমালয়ের দুর্যোগ এখন একই সঙ্গে মানবিক, অবকাঠামোগত, জ্বালানি ও সীমান্ত নিরাপত্তার সংকট।

তিব্বত: পানি-ভূকৌশলের কেন্দ্র

এই জায়গাতেই হিমালয়ের পরিবেশগত সংকট সরাসরি ভূ-রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়। তিব্বত মালভূমি থেকে ব্রহ্মপুত্র (বা ইয়ারলুং সাংপো), সিন্ধু, মেকং, সালউইনসহ এশিয়ার বহু গুরুত্বপূর্ণ নদী উৎপন্ন হয়েছে। ফলে উজানের পরিবেশ, পানি ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ভাটির দেশগুলোর জন্য অত্যন্ত কৌশলগত গুরুত্ব বহন করে।

চীন তিব্বত অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ ও পানি ব্যবস্থাপনার জন্য বড় অবকাঠামো গড়ে তুলছে। এসব প্রকল্পের নিজস্ব অর্থনৈতিক ও জ্বালানি সুবিধা রয়েছে। কিন্তু ভাটির দেশগুলোর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন জাগে–নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ, তথ্য বিনিময়, আকস্মিক দুর্যোগের পূর্বাভাস এবং দীর্ঘমেয়াদি পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পর্যাপ্ত স্বচ্ছতা কীভাবে নিশ্চিত হবে?

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা জরুরি–কোনো একটি বন্যাকে সরাসরি কোনো বাঁধ বা উজানের পানি ছাড়ার ফল বলে ঘোষণা করা বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক নয়। ২০২৬ সালের রসুয়া ঘটনাতেও প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রাকৃতিক বরফ-শিলা ধস ও আকস্মিক বন্যাপ্রবাহের (পধংপধফরহম ভষড়ড়ফ ঢ়ৎড়পবংং) দিকেই ইঙ্গিত করেছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে উজান-ভাটির তথ্যব্যবস্থা ও অবকাঠামোগত স্বচ্ছতার প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক। বরং বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন: তথ্য কার কাছে, কখন পৌঁছাবে?

রসুয়া বিপর্যয়ের পর এই প্রশ্নটি আরও জোরালোভাবে সামনে এসেছে। নেপাল ও চীনের কর্মকর্তারা ২০২৬ সালের মে মাসেই বন্যা, আবহাওয়া ও হিমবাহ-সম্পর্কিত ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু আগস্টের বিপর্যয়ের পর নেপালের কর্মকর্তারা আরও দ্রুত ও বিস্তৃত তথ্য বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। অন্যদিকে চীনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, প্রয়োজনীয় তথ্য যথাসময়েই দেওয়া হয়েছে।

২৬ আগস্টই নেপাল ও চীনের মধ্যে আবহাওয়াগত তথ্য বিনিময় আরও জোরদারের বিষয়ে সমঝোতা হয়। চীনা পক্ষ জানায়, তিব্বতের সংশ্লিষ্ট এলাকায় উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের রেকর্ড পাওয়া যায়নি এবং এই বন্যাকে কেবল বৃষ্টির ফল বলার কোনো জোরালো ভিত্তি নেই।

এই মতপার্থক্য একটি মৌলিক সত্যকে সামনে আনে–তথ্য

থাকা এবং সময়মতো কার্যকর আগাম সতর্কতা পৌঁছানো এক কথা নয়।

একটি নদীর পানির উচ্চতা বাড়ছে—এই তথ্য যদি কয়েক ঘণ্টা আগে পাওয়া যায়, তবে তা বহু মানুষের জীবন রক্ষা করতে পারে। কিন্তু তথ্য যদি আসে ঘটনার পরে, তবে তা আর আগাম সতর্কতা থাকে না; তা কেবল একটি দুর্যোগের আনুষ্ঠানিক নথি হয়ে দাঁড়ায়।

কোশী, গণ্ডকী ও কার্নালী: বিপদের তিন করিডর

- **কোশী:** কোশী অববাহিকা তিব্বত, নেপাল ও ভারতের সঙ্গে যুক্ত। অরুণ, সুনকোশী ও তামোরসহ বিভিন্ন নদী মিলে বৃহৎ কোশী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। হিমবাহ-হ্রদ, ভূমিধস, অতিরিক্ত পলি এবং আকস্মিক বন্যা এই অববাহিকার প্রধান ঝুঁকি। কোশী অববাহিকায় ৪২টি সম্ভাব্য বিপজ্জনক হিমবাহ-হ্রদ শনাক্ত হওয়ার তথ্যই প্রমাণ করে এটি কতটা স্পর্শকাতর এলাকা। তিব্বত থেকে নেপাল হয়ে ভারত ও পরে গঙ্গায় প্রবেশ করার কারণে কোশীর কোনো বড় দুর্যোগ কোনো একক দেশের সীমানায় সীমাবদ্ধ থাকে না।

- **গণ্ডকী:** গণ্ডকী বা নারায়ণী ব্যবস্থার সঙ্গে তিব্বতের উচ্চভূমির সরাসরি জলসম্পর্ক রয়েছে। ত্রিশূলীসহ এর বিভিন্ন শাখা পাহাড়ি অঞ্চলের অত্যন্ত খাড়া ভূপ্রকৃতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। ২০২৬ সালের রসুয়া দুর্যোগের প্রভাব ত্রিশূলী-নারায়ণী করিডরে ছড়িয়ে পড়ায় এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, উচ্চভূমির একটি আকস্মিক ঘটনা কীভাবে মুহূর্তের মধ্যে নিচের দিকে বহু অবকাঠামো ও জনবসতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারে।

- **কার্নালী:** কার্নালী নদী তিব্বত থেকে নেপাল হয়ে ভারতের সমতলে প্রবেশ করে ঘাগরা নামে পরিচিত হয় এবং পরিশেষে গঙ্গা ব্যবস্থায় যুক্ত হয়। এর প্রধান সমস্যা এর দুর্গম ভৌগোলিক অবস্থান। এখানে দুর্যোগের পর যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে উদ্ধার অভিযান, চিকিৎসা ও খাদ্য সরবরাহ অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে। ভবিষ্যতে হিমবাহ ও তুষারের পরিবর্তিত আচরণ এই নদীর মৌসুমি প্রবাহের চরিত্রকেও বদলে দিতে পারে।

ব্রহ্মপুত্র: বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি উদ্বেগ

হিমালয়ের পানি-ভূকৌশলের সবচেয়ে সংবেদনশীল অধ্যায়গুলোর একটি হলো ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা।

ইয়ারলুং সাংপো তিব্বত মালভূমি থেকে প্রবাহিত হয়ে ভারতের অরুণাচল ও আসাম অঞ্চলে প্রবেশ করে ব্রহ্মপুত্র নাম ধারণ করে। পরবর্তীতে এটি বাংলাদেশে প্রবেশ করে যমুনা হিসেবে এবং গঙ্গা-পদ্মা ব্যবস্থার সঙ্গে মিলিত হয়।

তিব্বতে কোনো একটি পাহাড়ি ঘটনা ঘটলেই তার তাৎক্ষণিক প্রভাব বাংলাদেশে পড়বে, এমন সরলরৈখিক সম্পর্ক সব সময় সঠিক নয়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে হিমবাহের পরিবর্তন, বৃষ্টিপাতের ধরনে বৈচিত্র্য, পলি পরিবহন, নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ এবং উজানের পানি ব্যবস্থাপনা পুরো অববাহিকার ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশের জন্য তাই হিমালয় কোনো দূরবর্তী বা বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড নয়; এটি দেশের পানি নিরাপত্তার মূল উজানভাগ।

বাংলাদেশের জন্য মূল সংকটগুলো কোথায়?

বাংলাদেশ হিমালয়ের কোনো ভূখণ্ডের মালিক নয়। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ নদীব্যবস্থার ভাটির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এই অঞ্চলের জলপ্রবাহের ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। ফলশ্রুতিতে, বাংলাদেশের পানি নিরাপত্তার সামনে মূলত তিনটি প্রধান স্তর রয়েছে:

১. অতিরিক্ত পানি ও আকস্মিক বন্যা: বর্ষাকালে উজানে অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত বা পাহাড়ি দুর্যোগের কারণে আকস্মিক প্রবাহ বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশে বন্যার চাপ বহুগুণ বেড়ে যায়।

২. দীর্ঘমেয়াদী পানি-স্বল্পতা: দীর্ঘমেয়াদে হিমবাহের ভাণ্ডার ক্ষয়প্রাপ্ত হলে এবং বরফ-তুষারের মৌসুমি ভারসাম্য নষ্ট হলে শুষ্ক মৌসুমে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহের চরিত্র আমূল বদলে যেতে পারে।

৩. পলি ও নদীর ভূ-আকৃতি পরিবর্তন: হিমালয়ের পাহাড়ি ধস ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে বিপুল পরিমাণ পলি নদীতে প্রবেশ করে। এই অতিরিক্ত পলি ভাটির নদীর তলদেশ ভরাট করা, চর জাগানো, নদীভাঙন এবং নৌপথের ওপর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

অতএব, বাংলাদেশের জাতীয় পানি নীতিকে শুধু 'কী পরিমাণ পানি পেলাম' এই সংকীর্ণ পরিসরে মাপলে চলবে না। বরং মূল প্রশ্ন হওয়া উচিত–উজানে কী ধরনের ভূতাত্ত্বিক ও জলবায়ুগত পরিবর্তন ঘটছে এবং সেই পরিবর্তন আগামী ৫, ১০ বা ২০ বছর পর বাংলাদেশের নদীব্যবস্থাকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করাবে?

পানি এখন ভূ-রাজনীতির নতুন কৌশলগত সম্পদ

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে পানি বহু দিন ধরেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনের যুগে এর গুরুত্ব ও সংবেদনশীলতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

একদিকে ভারত-নেপাল পানি সম্পর্ক, অন্যদিকে ভারত-বাংলাদেশ নদী ব্যবস্থাপনা; এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চীন-তিব্বত এবং ব্রহ্মপুত্রের উজান অঞ্চলের ভূমিকা। সব মিলিয়ে হিমালয়কে ঘিরে একটি জটিল ও বহুস্তরীয় পানি-কূটনীতি গড়ে উঠছে। এখানে কেবল দ্বিপক্ষীয় চুক্তি বা আলোচনায় দীর্ঘস্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। কারণ একটি নদী অববাহিকা যখন তিন বা চারটি দেশকে অতিক্রম করে, তখন এক দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অন্য দেশের জাতীয় নিরাপত্তাকেও সরাসরি প্রভাবিত করে।

এ কারণে ভবিষ্যৎ পানি কূটনীতিতে কেবল 'নদীর পানি ভাগাভাগি'র পুরোনো ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে 'সমন্বিত অববাহিকা নিরাপত্তা' (Integrated Basin Security)-র ধারণায় প্রবেশ করতে হবে।

'হিমালয় নিরাপত্তা কাঠামো' কেন সময়ের দাবি?

হিমালয়ের দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন এমন একটি সমন্বিত আঞ্চলিক কাঠামো, যেখানে পানি, বরফ, আবহাওয়া, দুর্যোগ ও অবকাঠামোকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা হবে। এর কয়েকটি মূল স্তম্ভ হতে পারে:

- এক. রিয়েল-টাইম তথ্য বিনিময়: চীন, নেপাল, ভারত ও বাংলাদেশকে নদীর পানির স্তর, বৃষ্টিপাত, হিমবাহ-হ্রদ, তুষারাবস্থা, ভূমিধস ও আকস্মিক প্রবাহ সম্পর্কে দ্রুত তথ্য বিনিময়ের একটি কার্যকর ডিজিটাল ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
- দুই. যৌথ হিমবাহ পর্যবেক্ষণ: উপগ্রহ চিত্র, ড্রোন, রাডার ও স্বয়ংক্রিয় সেন্সর প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঝুঁকিপূর্ণ ও সংবেদনশীল অঞ্চলগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার।
- তিন. বহুদেশীয় আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা: সতর্কবার্তা কেবল রাজধানী বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পৌঁছালেই চলবে না; তা সীমান্তবর্তী গ্রাম, স্থানীয় প্রশাসন, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, পর্যটনকেন্দ্র এবং সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে।
- চার. অবকাঠামোর নতুন ঝুঁকি মানচিত্র: হিমালয় অঞ্চলের নদীগুলোর একেবারে তীর ঘেঁষে নতুন সড়ক, সেতু, টানেল বা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের পূর্বে জলবায়ু-সহনশীল ডিজাইন (climate-resilient design) বাধ্যতামূলক করা উচিত।
- পাঁচ. যৌথ নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা: কোশী, গণ্ডকী, কার্নালী ও ব্রহ্মপুত্রের মতো আন্তঃসীমান্ত নদীগুলোকে কৃত্রিম রাজনৈতিক সীমারেখায় বিভক্ত নদী হিসেবে না দেখে একটি অখণ্ড পরিবেশগত ব্যবস্থা (ecological system) হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।
- ছয়. জলবায়ু অর্থায়ন ও ক্ষতিপূরণ: হিমালয়ের বিপর্যয় ও ক্ষয়ক্ষতি কেবল সংশ্লিষ্ট পাহাড়ি দেশগুলোর নিজস্ব সমস্যা নয়। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ যোগসূত্র থাকায় 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' (Loss and Damage) এবং অভিযোজন অর্থায়নের আওতায় এসব ঝুঁকি মোকাবিলায় জোরালো আন্তর্জাতিক তহবিল গঠন করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের করণীয়: ভাটির দেশ থেকে 'অববাহিকা অংশীদার'

বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় কৌশলগত ভুল হবে নিজেকে কেবল একটি অসহায় 'ভাটির দেশ' হিসেবে দেখা। ঢাকার প্রয়োজন একটি সুনির্দিষ্ট 'হিমালয়ান ওয়াটার ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্ম'–যেখানে হিমবাহ, তুষারাবস্থা, বৃষ্টিপাত, নদীর প্রবাহ, পলিপ্রবাহ, বাঁধের অবস্থা, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, ভূমিধস এবং GLOF-এর তথ্য নিয়মিত ও নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা হবে।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, আবহাওয়া অধিদপ্তর, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, পররাষ্ট্র

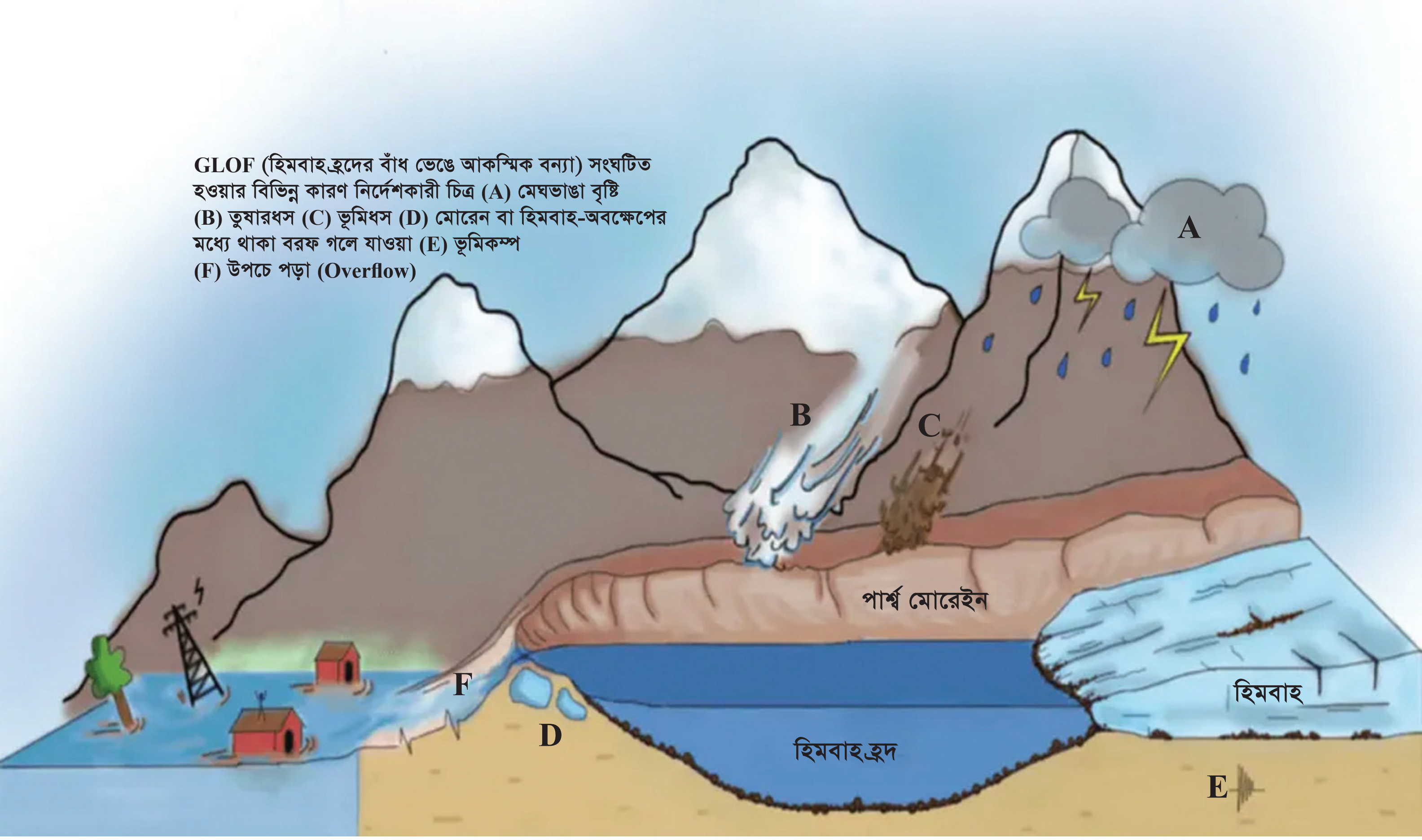

GLOF (হিমবাহ-হ্রদের বাঁধ ভেঙে আকস্মিক বন্যা) সংঘটিত হওয়ার বিভিন্ন কারণ নির্দেশকারী চিত্র (A) মেঘভাঙা বৃষ্টি (B) তুষারধস (C) ভূমিধস (D) মোরেন বা হিমবাহ-অবক্ষেপের মধ্যে থাকা বরফ গলে যাওয়া (E) ভূমিকম্প (F) উপচে পড়া (Overflow)

মন্ত্রণালয় এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের নিয়ে একটি সমন্বিত গবেষণা কাঠামো গড়ে তোলা যেতে পারে। একই সঙ্গে নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে জলবায়ু ও নদী গবেষণা সহযোগিতা এবং ভারত ও চীনের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক তথ্য বিনিময়ের কূটনৈতিক উদ্যোগগুলোকে আরও জোরদার করা অত্যন্ত জরুরি।

এখানে বাংলাদেশের মূল স্বার্থ কেবল পরিমিত পানি পাওয়া নয়; বরং উজানের পরিবর্তন সম্পর্কে আগে থেকেই ওয়াকিবহাল থাকা–এটাই হলো সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা।

হিমালয়ের সংকট শেষ পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার সংকট

হিমালয়ের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমান্ত থাকতে পারে, কিন্তু পানি, বরফ, মেঘ ও নদীর কোনো রাজনৈতিক সীমানা নেই।

তিব্বতের উচ্চভূমিতে একটি বরফধস মুহূর্তের মধ্যে নেপালের নদীব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করতে পারে। নেপালের পাহাড়ি অঞ্চলে একটি আকস্মিক ধস ভারতের সমতল জনপদে বন্যার ঝুঁকি চরম মাত্রায় বাড়িয়ে দিতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ নদীব্যবস্থার এসব পরিবর্তন পরিশেষে বাংলাদেশের কৃষি, নদীভাঙন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সামগ্রিক পানি নিরাপত্তায় গভীর প্রভাব ফেলে।

২৬ আগস্ট ২০২৬-এর রসুয়া বিপর্যয় তাই কেবল নেপালের একটি খণ্ডিত দুর্যোগ নয়। এটি নির্মমভাবে প্রমাণ করেছে যে হিমালয়ের নতুন ঝুঁকিগুলো কত দ্রুত একটি প্রাকৃতিক ঘটনা থেকে মানবিক সংকট, অবকাঠামোগত বিপর্যয় এবং আন্তঃসীমান্ত কূটনৈতিক জটিলতায় রূপ নিতে পারে।

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো–এই বিপদ সব সময় প্রচলিত পূর্বাভাস কাঠামোর ছকে ধরা দেবে না। একটি হিমবাহ-হ্রদ বিস্ফোরিত হতে পারে, একটি বরফ-শিলার বিশাল ধস নামতে পারে, একটি পাহাড়ি ঢাল নদীকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে ফেলতে পারে এবং কোনো অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত সেই কৃত্রিম বাঁধ ভেঙে নিমেষেই একটি নদীকে ধ্বংসের মহাস্রোতে পরিণত করতে পারে।

এই কঠোর বাস্তবতায় কেবল আরও বেশি বাঁধ, সড়ক বা জলবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা কোনো স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যবেক্ষণ, আন্তঃসীমান্ত তথ্য বিনিময়, জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, যৌথ নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা এবং পারস্পরিক আস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত পানি কূটনীতি।

হিমালয়ের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা মানে কেবল উঁচু পাহাড়গুলোর নিরাপত্তা নয়। এটি এশিয়ার সামগ্রিক পানি নিরাপত্তা। এটি দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্য নিরাপত্তা। এটি নেপালের জ্বালানি নিরাপত্তা। এটি ভারতের নদী ও কৃষি নিরাপত্তা। এবং পরিশেষে–বাংলাদেশের অখণ্ড অস্তিত্ব ও পানি নিরাপত্তারও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন।

রসুয়া সীমান্তে ২০২৬ সালের এই ভয়াবহ বিপর্যয় তাই কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমাপ্তি নয়; বরং এটি হিমালয়ের নতুন যুগের এক অবধারিত ও কঠোর সতর্কবার্তা। ■

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান।

খলিলুর রহমানের হাতে জাতিসংঘের নেতৃত্ব, বাংলাদেশের প্রত্যাশা কতটা পূরণ হবে?

আল-উম্মাহ ডেস্ক

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান।

গত ৮ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনের সমাপনী পর্বে শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে প্রায় চার দশক পর আবারও বাংলাদেশের কোনো প্রতিনিধি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের এত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে আসীন হলেন।

শপথ অনুষ্ঠানে ড. খলিলুর রহমান সততা, আনুগত্য ও

বিবেকের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি বলেন, জাতিসংঘের বহুপাক্ষিক ব্যবস্থা এমন এক সময় পরীক্ষার মুখে পড়েছে, যা আগে কখনো দেখা যায়নি। তবে একই সঙ্গে এটি নতুন সুযোগও তৈরি করেছে। বৈশ্বিক সমস্যাগুলো দ্রুত বা সহজে সমাধান করা সম্ভব না হলেও সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যেখানে মতের মিল রয়েছে, সেখানে অভিন্ন ভিত্তি খুঁজে বের করার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

৯৯ ভোটে ঐতিহাসিক জয়

ড. খলিলুর রহমানের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পথ সুগম হয় চলতি বছরের ২ জুন। ওই দিন জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত গোপন ব্যালটের নির্বাচনে তিনি সাইপ্রাসের প্রার্থী আন্দ্রেয়াস কাকুরিসকে পরাজিত করেন। খলিলুর রহমান পান ৯৯ ভোট এবং কাকুরিস পান ৯১ ভোট। মোট ১৯০টি ভোট পড়েছিল এবং কোনো ভোট বাতিল বা বিরত থাকেনি। জাতিসংঘের আঞ্চলিক রোটেশন পদ্ধতি অনুযায়ী এ পদটি এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত ছিল।

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, ৮১তম অধিবেশন ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত চলবে। এই পুরো সময় সাধারণ পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন খলিলুর রহমান। অধিবেশনের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে–'আস্থা পুনরুদ্ধার, রূপান্তর ব্যবস্থাপনা: সবার জন্য কার্যকর একটি জাতিসংঘ'।

কেন গুরুত্বপূর্ণ খলিলুর রহমানের এই দায়িত্ব?

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বিশ্বের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে এবং প্রতিটি দেশেরই একটি করে ভোট রয়েছে। বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা, উন্নয়ন, মানবাধিকার এবং আন্তর্জাতিক আইনসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের এটি প্রধান আন্তর্জাতিক মঞ্চ। সাধারণ পরিষদের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক না হলেও আন্তর্জাতিক জনমত গঠন এবং বৈশ্বিক কূটনীতির ক্ষেত্রে এর রাজনৈতিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

ড. খলিলুর রহমান এমন এক সময়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, যখন ইউক্রেন যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত, শরণার্থী সংকট, জলবায়ু পরিবর্তন, উন্নয়ন অর্থায়নের ঘাটতি, মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার ওপর আস্থার সংকট জাতিসংঘকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে।

এর পাশাপাশি ২০২৬ সালের শেষ দিকে জাতিসংঘের নতুন মহাসচিব নির্বাচনের প্রক্রিয়াও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। ফলে তাঁর সভাপতিত্বের এই বছরটি জাতিসংঘের জন্য রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

খলিলুর রহমানের ছয় অগ্রাধিকার

সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার আগে নিজের ভিশন স্টেটমেন্টে ড. খলিলুর রহমান ছয়টি প্রধান অগ্রাধিকার তুলে ধরেছিলেন, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে জাতিসংঘের প্রতি বৈশ্বিক আস্থা পুনর্গঠন।

- প্রথমত, শান্তি ও নিরাপত্তা: প্রতিরোধমূলক কূটনীতি, রাজনৈতিক সমাধান ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দিতে চান তিনি। বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের অভিজ্ঞতাকে তিনি এ ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে চান। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে দুই লাখের বেশি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী দায়িত্ব পালন করেছেন বলে তাঁর ভিশনে উল্লেখ করা হয়েছে।
- দ্বিতীয়ত, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি): এসডিজি বাস্তবায়নের গতি বাড়ানো তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবায়নের মধ্যকার ব্যবধান কমানোর ওপর তিনি জোর দিয়েছেন।
- তৃতীয়ত, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সুরক্ষা: জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ জলবায়ু অর্থায়ন, সহনশীলতা এবং ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর স্বার্থ আন্তর্জাতিক আলোচনায় আরও জোরালোভাবে তুলে ধরতে পারে।
- চতুর্থত, মানবাধিকার ও শরণার্থী ইস্যু: মানবিক সহায়তা, শরণার্থী ও অভিবাসন–বিশেষ করে রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠীর অধিকার নিয়ে কাজ করার কথা জানিয়েছেন তিনি। দায়িত্ব গ্রহণের পরও তিনি রোহিঙ্গাদের মতো রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠীর কণ্ঠ জাতিসংঘে তুলে ধরার অঙ্গীকার করেছেন।
- পঞ্চমত, প্রযুক্তিগত শাসনব্যবস্থা: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা। দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির যুগে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে প্রযুক্তিগত বৈষম্য কমানোর বিষয়টি তাঁর এজেন্ডায় রয়েছে।
- ষষ্ঠত, জাতিসংঘ সংস্কার: বর্তমান বিশ্বের বাস্তবতার সঙ্গে জাতিসংঘকে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ, কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলতে হবে। শুধু আনুষ্ঠানিক সংস্কার নয়, প্রতিষ্ঠানটির ওপর মানুষের হারানো আস্থা ফিরিয়ে আনার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন তিনি।

দায়িত্ব পালনে বাইরের নির্দেশনা নয়

দায়িত্ব গ্রহণের আগে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে ড. খলিলুর রহমান স্পষ্ট করে বলেছেন, জাতিসংঘের সভাপতির দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তিনি জাতিসংঘের বাইরের কারও কোনো নির্দেশনা গ্রহণ করবেন না। তিনি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সংলাপ, সহযোগিতা ও সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করার ওপর জোর দিয়েছেন।

তাঁর নেতৃত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে উন্মুক্ত যোগাযোগকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সাংবাদিকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ এবং দ্বিমুখী সংলাপ বজায় রাখার কথা জানিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরির ভূমিকা পালন করতে চান তিনি।

জাতিসংঘকে 'ভবিষ্যতের উপযোগী' করার লক্ষ্য

দায়িত্ব গ্রহণের পর ড. খলিলুর রহমান তাঁর পূর্বঘোষিত 'আস্থা পুনরুদ্ধার ও রূপান্তর ব্যবস্থাপনা' ধারণার সঙ্গে নতুন করে আরেকটি বিষয় যুক্ত করেছেন–জাতিসংঘকে ভবিষ্যতের জন্য উপযোগী করে তোলা।

তিনি মনে করেন, ১৯৪৫ সালে যে বাস্তবতায় জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বর্তমান বিশ্বের বাস্তবতা তার চেয়ে অনেক আলাদা। তাই বর্তমান সময়ের সংঘাত, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, জলবায়ু পরিবর্তন, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও মানবিক সংকট মোকাবিলায় জাতিসংঘের কাঠামো ও কার্যক্রমকে আরও যুগোপযোগী করতে হবে।

বাংলাদেশের জন্য প্রত্যাশা কতটা পূরণ হবে?

ড. খলিলুর রহমানের সভাপতিত্ব বাংলাদেশের জন্য সরাসরি কোনো নির্বাহী ক্ষমতা তৈরি করবে না। কারণ সাধারণ পরিষদের সভাপতি কোনো নির্দিষ্ট দেশের প্রতিনিধি হিসেবে নয়, বরং পুরো সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ফলে এই পদ ব্যবহার করে বাংলাদেশের স্বার্থকে একতরফাভাবে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ সীমিত। তবে বিশ্বের বিভিন্ন সংকটে ন্যায়সঙ্গত ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান প্রতিষ্ঠায় তাঁর কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা বেশ কাজে লাগতে পারে।

- রোহিঙ্গা সংকট: দীর্ঘদিন ধরে মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়ে আছে। ড. খলিলুর রহমান নিজে রোহিঙ্গা ইস্যুতে কাজ করেছেন এবং শরণার্থী শিবির পরিদর্শনের অভিজ্ঞতাও তাঁর রয়েছে। ফলে রাষ্ট্রহীন রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবাসনের বিষয়টি জাতিসংঘের আলোচনায় আরও জোরালোভাবে রাখার সুযোগ তাঁর সামনে রয়েছে।

- জলবায়ু অর্থায়ন: জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর দাবি–বিশেষ করে অভিযোজন অর্থায়ন, ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা এবং প্রযুক্তি সহায়তার বিষয়গুলো বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক অগ্রাধিকার। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে তিনি এ আলোচনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর কণ্ঠকে আরও দৃশ্যমান করতে পারেন।

- স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ: বাংলাদেশ এলডিসি উত্তরণের পথে রয়েছে। এই উত্তরণের ফলে বাণিজ্যিক সুবিধা, উন্নয়ন অর্থায়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে যেসব চ্যালেঞ্জ তৈরি হবে, সেগুলোকে বৃহত্তর উন্নয়নশীল বিশ্বের আলোচনার সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব।

- শান্তিরক্ষা কার্যক্রম: জাতিসংঘের বিভিন্ন মিশনে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের সংস্কার, নিরাপত্তা, নারী শান্তিরক্ষীর অংশগ্রহণ এবং তাঁদের ভূমিকার স্বীকৃতির বিষয়গুলো বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠ জোরালো করা: উন্নয়নশীল ও জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর স্বার্থ, বহুপাক্ষিকতা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ওপর তাঁর প্রচারণায় জোর দেওয়া হয়েছিল। ফলে তাঁর সভাপতিত্বে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিন্ন স্বার্থ নিয়ে আলোচনা আরও গতি পাবে বলে আশা করা যায়।

সামনে বড় পরীক্ষা

ড. খলিলুর রহমানের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে বর্তমানের মতবিভক্ত বিশ্বে ঐকমত্য তৈরি করা। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, গাজা ও মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত, পরাশক্তিগুলোর পারস্পরিক বিরোধ, বাণিজ্য প্রতিযোগিতা এবং বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানের ওপর আস্থার সংকট সাধারণ পরিষদের কার্যক্রমকে কঠিন করে তুলতে পারে।

এ অবস্থায় তাঁর ঘোষিত 'সেতুবন্ধনকারী' ভূমিকা কতটা কার্যকর হয়, সেটিই হবে মূল পরীক্ষা। কারণ সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে তাঁর মূল শক্তি হবে আলোচনার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা, বিভিন্ন পক্ষকে একই টেবিলে আনা এবং সমঝোতার পথ উন্মুক্ত করা।

জাতিসংঘের ৮১তম অধিবেশনের শুরুতেই তাই ড. খলিলুর রহমানের এই দায়িত্ব কেবল বাংলাদেশের জন্য মর্যাদার বিষয় নয়; এটি তাঁর ব্যক্তিগত কূটনৈতিক দক্ষতা এবং বাংলাদেশের বহুপাক্ষিক কূটনীতিরও একটি বড় পরীক্ষা।

চার দশক পর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির আসনে বাংলাদেশের একজন প্রতিনিধি আসীন হয়েছেন। এখন প্রত্যাশা হলো–এই সুযোগ যেন কেবল একটি প্রতীকী অর্জন হয়ে না থাকে; বরং রোহিঙ্গা সংকট, জলবায়ু পরিবর্তন, শান্তিরক্ষা, উন্নয়ন অর্থায়ন ও বৈশ্বিক দক্ষিণের স্বার্থে কার্যকর আন্তর্জাতিক উদ্যোগের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। একই সঙ্গে ড. খলিলুর রহমানের নেতৃত্বে জাতিসংঘ যদি আস্থা, সংলাপ ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতার পথে কিছুটা হলেও এগিয়ে যেতে পারে, সেটিই হবে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় সাফল্য। ■

যুদ্ধাপরাধীরা যখন নায়ক হয়ে ওঠে

ইসাম শেহাদাত
সম্পাদক, ডেইলি সাবাহ, ইস্তাম্বুল

বলকান অঞ্চল প্রতিটি সংকটের মধ্য দিয়ে বারবার প্রমাণ করে চলেছে–তার ভূগর্ভে এমন এক ইতিহাস ও স্মৃতি চাপা পড়ে আছে, যা কখনোই পুরোপুরি ঘুমিয়ে যায় না। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরের শুরুতে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আন্তর্জাতিক আদালতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত রাতকো ম্লাদিচের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সেই পুরোনো ক্ষতকে আবারও উন্মুক্ত করেছে, যে ক্ষতকে অনেকেই হয়তো শুকিয়ে গেছে বলে ধরে নিয়েছিলেন।

ম্লাদিচকে নায়ক হিসেবে উপস্থাপন করে আয়োজিত শেষকৃত্যের ঘটনায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষত তুরস্কের নিন্দা নিছক ক্ষণস্থায়ী প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। এর পেছনে রয়েছে আরও গভীর উদ্বেগ। যুদ্ধাপরাধীদের মহিমান্বিত করা শুধু অতীতের স্মৃতির প্রতি অবমাননা নয়; এটি একই সঙ্গে প্রমাণ করে যে সংঘাতের মূল কারণগুলো হয়তো কখনোই প্রকৃত অর্থে নিরসন হয়নি–বরং রাজনৈতিক সমঝোতার আড়ালে সেগুলোকে সাময়িকভাবে হিমায়িত করে রাখা হয়েছিল।

MRTVI SU
NE, ONI SU ŽIVI
ALI VI TO NE
OSJEĆATE
HASANOVIĆ
(OSMAN)
MUSTAFA
KRIVAČE
HAN PIJESAK

বর্বরতার বীজ

টিটোর যুগোস্লাভিয়া গড়ে উঠেছিল 'ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য' স্লোগানের ওপর। এটি ছিল একটি রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক প্রকল্প, যার মাধ্যমে ছয়টি প্রজাতন্ত্র এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে একটি অভিন্ন পরিচয়ের কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু একটি রাষ্ট্রীয় স্লোগান কখনোই প্রকৃত পুনর্মিলনের বিকল্প হতে পারে না। ফলে বহু ঐতিহাসিক ক্ষত বাস্তবিক অর্থে নিরাময় না হয়ে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে চাপা পড়ে রইল। আপাত শান্তির এই আবরণ পরবর্তী সময়ে এক বিস্ফোরক বাস্তবতায় রূপ নেয়।

১৯৮০-এর দশকে অর্থনৈতিক সংকট গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রব্যবস্থার দুর্বলতাগুলোও স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। এই ব্যর্থতা মোকাবিলার পরিবর্তে স্লোভোদন মিলোশেভিচের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক শক্তি চরম জাতীয়তাবাদী বক্তব্যকে সামনে নিয়ে আসে।

১৩৮৯ সালের কসোভো যুদ্ধকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হতে থাকে, যেন তা কোনো দূর অতীতের ইতিহাস নয়, বরং সমসাময়িক রাজনৈতিক বাস্তবতার অংশ। এর মধ্য দিয়ে পুরোনো এক ভুক্তভোগী-মানসিকতা পুনরুজ্জীবিত করা হয়। বসনীয় মুসলমানদেরও 'আক্রমণকারী তুর্কি' পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের ধারণাকে উসকে দেওয়া হয়।

এটি ছিল রাজনৈতিক প্রকৌশলের একটি রূপ—রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থতা, অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং নাগরিকদের মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করতে অক্ষমতার মতো বাস্তব সমস্যাগুলো থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে নিতে ইতিহাস ও সম্মিলিত স্মৃতিকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা।

এই প্রক্রিয়াকে অন্তত দুটি দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমত, আন্তঃপ্রজন্মগত ট্রমা। একটি জনগোষ্ঠী যখন নিজেকে চিরন্তন ভুক্তভোগী হিসেবে দেখতে শুরু করে, তখন প্রতিরোধমূলক সহিংসতাকেও নৈতিক অধিকার হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা তৈরি হতে পারে। দ্বিতীয়ত, দায়বদ্ধতার বিলোপ। ব্যক্তির নিজস্ব অপরাধবোধ জাতীয় কর্তব্য, রাষ্ট্রীয় আনুগত্য এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ পালনের ধারণার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

এমন উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে প্রতিবেশী আর প্রতিবেশী থাকে না—সে হয়ে ওঠে ষড়যন্ত্রকারী বা গুপ্তচর। এমনকি শিশুও হয়ে ওঠে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ হুমকি। আর সেখান থেকেই বর্বরতার জন্য একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি হয়।

পদ্ধতিগত মুছে ফেলার কৌশল

ম্লাদিচের নেতৃত্বাধীন 'আর্মি অব রিপাবলিকা স্রেপস্কা'র অভিযানগুলোকে কেবল সামরিক অভিযান হিসেবে দেখলে এর প্রকৃত চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আড়ালে থেকে যায়। এসব অভিযানের মধ্যে ছিল একটি দ্বৈত মুছে ফেলার প্রবণতা—একদিকে সাংস্কৃতিক, অন্যদিকে জনমিতিক।

লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেওয়া এবং মসজিদ ও ঐতিহাসিক স্থাপনা ধ্বংস করা ছিল একটি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের চিহ্ন মুছে দেওয়ার প্রচেষ্টা। অন্যদিকে পুরুষ ও কিশোরদের হত্যা করা ছিল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ধারাবাহিকতা ভেঙে দেওয়ার এক ভয়াবহ প্রয়াস। সারাজেভো ও স্রেব্রেনিৎসার মতো স্থানে সংঘটিত ঘটনাগুলো তাই শুধু যুদ্ধের ঘটনা নয়; এগুলো ছিল জনসংখ্যাগত বাস্তবতা পরিবর্তনের এক চরম প্রকল্প।

১৯৯৩ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে বসনীয় ক্রোটদের সঙ্গে

মুসলমানদের সম্পর্কও সংঘাতের নতুন মাত্রা তৈরি করে। প্রাথমিক রাজনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতার পর তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়। মোস্তারের ঐতিহাসিক পুরোনো সেতুতে গোলাবর্ষণ তার একটি প্রতীকী উদাহরণ। এটি শুধু একটি সামরিক স্থাপনা ধ্বংসের ঘটনা ছিল না; সেতুটি ছিল শহরের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও বহুত্ববাদী ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। তার ধ্বংস সেই সাংস্কৃতিক স্মৃতির ওপরও আঘাত হেনেছিল।

ইজেতবেগোভিচের ভিন্ন পথ

এই ভয়াবহ ধসের মধ্যেও আলিয়া ইজেতবেগোভিচ একজন বিরল বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি নিজের সভ্যতাগত পরিচয় বিসর্জন না দিয়েও সংঘাতের নৈতিক সীমারেখা ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন।

বসনীয় মুসলমানদের ওপর সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের প্রতিশোধ হিসেবে তিনি উপাসনালয় ধ্বংস কিংবা সার্ব ও ক্রোট বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে লক্ষ্যবস্তু করার পথ গ্রহণ করেননি। ১৯৯৫ সালে যখন নিজের জনগণকে সম্পূর্ণ বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য তাকে ডেটন চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হয়, তখন তিনি এক তিক্ত শান্তিকে বাস্তবসম্মত পথ হিসেবে গ্রহণ করেন। সেই শান্তি সব প্রশ্নের উত্তর দেয়নি, সব ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেনি; কিন্তু তা রক্তপাত বন্ধ করেছিল এবং পরবর্তী সময়ে ন্যায়বিচারের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করেছিল।

বলকানে তুরস্কের ভূমিকা

বসনিয়া-হার্জেগোভিনার পরিস্থিতিকে বৃহত্তর আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। এই প্রেক্ষাপটে তুরস্কের ভূমিকা শুধু আবেগ বা ঐতিহাসিক স্মৃতির বিষয় নয়; এর সঙ্গে ইতিহাস, জনমিতি ও কৌশলগত বাস্তবতা–তিনটি বিষয়ই ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

প্রথমত, ঐতিহাসিকভাবে শতাব্দীব্যাপী উসমানীয় উপস্থিতি বলকান অঞ্চলে স্থাপত্য, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকার রেখে গেছে। দ্বিতীয়ত, বসনীয়দের সঙ্গে তুরস্কের একটি গভীর সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে, যা সমসাময়িক তুর্কি-মুসলিম পরিচয়ের সঙ্গেও বিভিন্নভাবে যুক্ত। তৃতীয়ত, কৌশলগতভাবে বসনিয়া পশ্চিম বলকান অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূরাজনৈতিক অবস্থান দখল করে আছে। ফলে সেখানে স্থিতিশীলতা শুধু স্থানীয় বিষয় নয়; বৃহত্তর আঞ্চলিক ভারসাম্যের সঙ্গেও তা সম্পর্কিত।

একই সময়ে বলকানে ক্ষমতার নতুন সমীকরণও তৈরি হচ্ছে। সার্বিয়া ক্রমবর্ধমানভাবে বিভিন্ন বহিরাগত শক্তির প্রভাব ও স্বার্থের সংযোগস্থলে পরিণত হচ্ছে–যার কিছু প্রবণতা আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রকল্পের সঙ্গেও সম্পর্কিত বলে সমালোচনা রয়েছে। এই ধরনের মেরুকরণ দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতার জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। ফলস্বরূপ, বলকান আবারও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হয়ে উঠলে অতীতের ক্ষতগুলোও নতুন করে রাজনৈতিক অর্থ পেতে পারে।

শর্তসাপেক্ষ পুনর্মিলন

ম্লাদিচের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা সামনে এনেছে: কোনো সংঘাতকে রাজনৈতিকভাবে 'হিমায়িত' করে রাখা আর সেই সংঘাতের সামাজিক ক্ষত নিরাময় করা এক কথা নয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সার্বিয়ার সঙ্গে যোগদানের আলোচনার ক্ষেত্রে যুদ্ধাপরাধীদের মহিমান্বিত করা ও গণহত্যা অস্বীকারের মতো বিষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা একটি বৃহত্তর নীতির সঙ্গে যুক্ত–ইউরোপীয় একীকরণ শুধু অর্থনৈতিক বা কূটনৈতিক সমঝোতার প্রকল্প নয়; এর সঙ্গে মানবাধিকার, আইনের শাসন ও অতীতের অপরাধের দায় স্বীকারের প্রশ্নও জড়িত।

অপরাধ ও তার ভুক্তভোগীদের স্মৃতি সংরক্ষণ তাই ভবিষ্যতে একই ধরনের অপরাধ প্রতিরোধের অন্যতম শর্ত। গণহত্যা অস্বীকারের বিরুদ্ধে আইনি ও সামাজিক অবস্থান এবং ঐতিহাসিক সত্য সংরক্ষণের উদ্যোগ–দুটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই স্মৃতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয় নতুন প্রজন্মের ওপর এমন অপরাধের যৌথ অপরাধবোধ চাপিয়ে দেওয়া, যা তারা করেনি; বরং তাদের সামনে সত্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা, যাতে তারা বুঝতে পারে কী ঘটেছিল এবং কেন তার পুনরাবৃত্তি করা যাবে না।

এখানেই পুনর্মিলনের প্রকৃত চ্যালেঞ্জ। অতীতকে ভুলে যাওয়া নয়, আবার অতীতের অপরাধের ভার নতুন প্রজন্মের ওপর চাপিয়ে দেওয়াও নয়–বরং সত্য, ন্যায়বিচার ও দায়িত্ববোধের ভিত্তিতে একটি নতুন সামাজিক স্মৃতি নির্মাণ করা।

স্মৃতির নৈতিক দায়

আলিয়া ইজেতবেগোভিচের চিন্তার আলোকে গণহত্যাকে শুধু একটি রাজনৈতিক অপরাধ হিসেবে দেখলে এর নৈতিক গভীরতা পুরোপুরি উপলব্ধি করা যায় না। এটি মানুষের মর্যাদা ও অস্তিত্বের ওপর সরাসরি আঘাত। তাঁর ‘উংপধঢ়ব ঃড় ঋৎববফড়স’ বা ‘স্বাধীনতার পথে পলায়ন’ গ্রন্থে অন্যায়ের মুখে নৈতিক নিরপেক্ষতার ধারণাকে তিনি কঠোরভাবে প্রশ্ন করেছেন।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধাপরাধীর মহিমান্বিতকরণ নিছক রাজনৈতিক মতামতের বিষয় নয়। এটি ভুক্তভোগীদের স্মৃতি ও মর্যাদার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। একজন যুদ্ধাপরাধীকে নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হলে তার হাতে নিহত মানুষের জীবন, তাদের পরিবার এবং তাদের ওপর সংঘটিত অপরাধের সত্য–সবকিছুকেই নতুন করে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়।

তবে অপরাধের নিন্দা করা কোনো জাতিকে সামগ্রিকভাবে অপরাধী সাব্যস্ত করার সমান নয়। একজন সার্ব যুদ্ধাপরাধী হতে পারেন, কিন্তু তার অপরাধের দায় পুরো সার্ব জনগোষ্ঠীর ওপর বর্তায় না। একইভাবে কোনো জাতির সদস্য হওয়া তার অপরাধীদের ক্ষমা বা মহিমান্বিত করার কারণ হতে পারে না।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব এখানেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রকে এমন এক ঐতিহাসিক স্মৃতি নির্মাণে ভূমিকা রাখতে হবে, যেখানে অপরাধ স্বীকার করা হবে, ভুক্তভোগীদের মর্যাদা রক্ষা করা হবে এবং নতুন প্রজন্মকে প্রতিহিংসার উত্তরাধিকার নয়, সত্য ও ন্যায়বিচারের শিক্ষা দেওয়া হবে।

স্লাদিচের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তাই কেবল একজন যুদ্ধাপরাধীর মৃত্যু বা শেষকৃত্যের ঘটনা নয়; এটি বলকানের অসম্পূর্ণ পুনর্মিলনের এক আয়না। ইতিহাসকে চাপা দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না; রাজনৈতিক সমঝোতা সাময়িকভাবে সংঘাত থামাতে পারে, কিন্তু স্মৃতি ও ন্যায়বিচারের প্রশ্নের সমাধান না হলে ক্ষত গভীরে থেকে যায়।

যুদ্ধাপরাধী যখন নায়ক হয়ে ওঠে, তখন শুধু অতীতই বিকৃত হয় না–ভবিষ্যতের জন্যও এক বিপজ্জনক বয়ান তৈরি হয়। আর সেই কারণেই ইতিহাসের স্মৃতি রক্ষা করা নিছক অতীতচর্চা নয়; এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একই বর্বরতার পুনরাবৃত্তি থেকে রক্ষা করার এক অপরিহার্য নৈতিক দায়িত্ব। ■

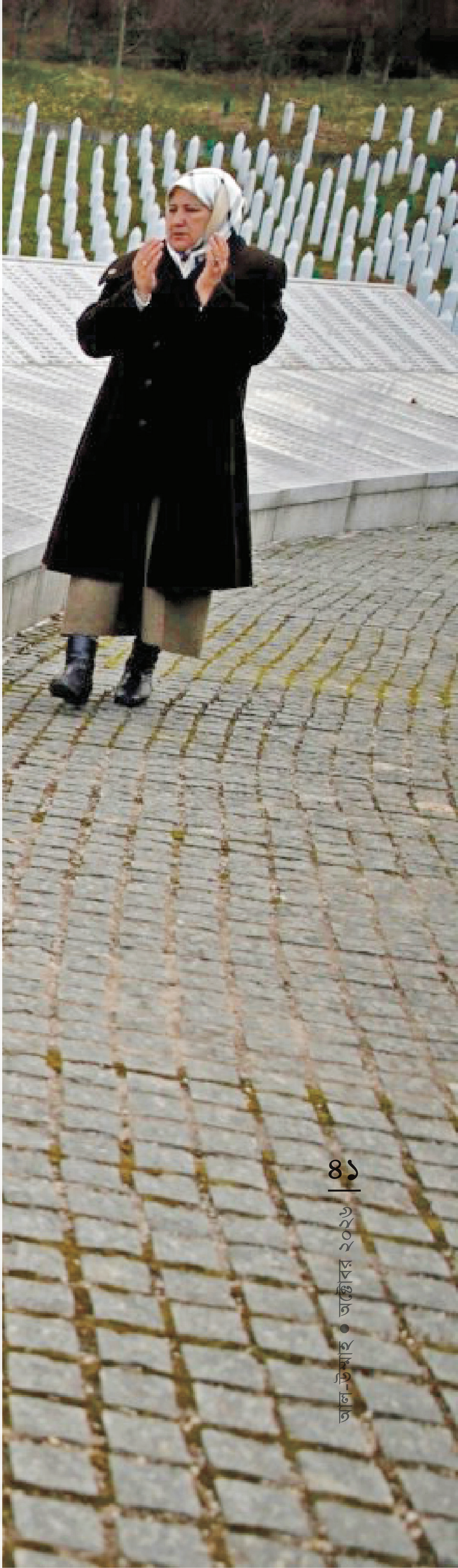

বঙ্গোপসাগরের নীল জলসীমা:

২০১৪-এর রায় ও বাংলাদেশের হারানো অধিকার

লে. কর্নেল (অব.) দিদার

০০০

২০১৪ সালের ৭ জুলাই বঙ্গোপসাগরের মানচিত্রে একটি ঐতিহাসিক সীমারেখা টানা হয়েছিল। কাগজে-কলমে সেটি ছিল আন্তর্জাতিক সালিশি ট্রাইব্যুনালের একটি রায়। কিন্তু বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সেই রেখার অর্থ কেবল একটি সীমারেখা নয়; এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে দেশের সার্বভৌমত্ব, জাতীয় নিরাপত্তা, মৎস্যসম্পদ, জ্বালানি নিরাপত্তা, সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy), কৌশলগত গভীরতা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্পদের অধিকার।

ভারত-বাংলাদেশ সমুদ্রসীমা বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছিল নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত জাতিসংঘের সমুদ্র আইনবিষয়ক কনভেনশন (UNCLOS)-এর অধীনে গঠিত সালিশি ট্রাইব্যুনালে। এই রায়কে বাংলাদেশের জন্য পুরোপুরি পরাজয় বলা যায় না। বিরোধপূর্ণ ২৫,৬০২ বর্গকিলোমিটার সমুদ্রাঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশ পেয়েছিল ১৯,৪৬৭ বর্গকিলোমিটার। পাশাপাশি, ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশের ২০০ নটিক্যাল মাইলের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (EEZ) এবং ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপানের (Continental Shelf) অধিকারও সুনির্দিষ্টভাবে নিশ্চিত করে।

তবে মূল প্রশ্নগুলো অন্য জায়গায়:

বাংলাদেশ কি তার সর্বোচ্চ সম্ভাব্য জাতীয় স্বার্থ উদ্ধার করতে পেরেছিল?

এই আইনি লড়াইয়ের আগে ও পরে বাংলাদেশ কি একটি পূর্ণাঙ্গ ও টেকসই জাতীয় সামুদ্রিক কৌশল প্রণয়ন করতে পেরেছে?

এক যুগ পর আজ সেই প্রশ্নগুলো নতুন করে জাতীয় পর্যালোচনার দাবি রাখে।

তালপট্টি থেকে সমুদ্রসীমা

বাংলাদেশ-ভারত সামুদ্রিক বিরোধের সূচনা ২০১৪ সালে নয়। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর থেকেই

সুন্দরবনের দক্ষিণ প্রান্ত, হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনা এবং বঙ্গোপসাগরের সংশ্লিষ্ট জলসীমা নিয়ে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক টানাপোড়েন ছিল।

এই বিরোধের ইতিহাসে 'দক্ষিণ তালপট্টি' (ভারতে যা 'নিউ মুর আইল্যান্ড' নামে পরিচিত) একটি বিশেষ প্রতীকী স্থান দখল করে আছে। তবে পরবর্তীতে প্রাকৃতিক ক্ষয় ও সমুদ্রপৃষ্ঠের পরিবর্তনের কারণে দ্বীপটির ভৌগোলিক অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। ফলে তালপট্টিকে ঘিরে যে রাজনৈতিক বয়ান তৈরি করা হয়, তার সঙ্গে বাস্তব ভূগোলের বৈসাদৃশ্য বোঝা জরুরি। গবেষণামূলক তথ্য অনুযায়ী, দ্বীপটি বহু আগেই সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গেছে।

তবে একটি ভৌগোলিক দ্বীপ বিলীন হলেও তার সঙ্গে সম্পর্কিত সামুদ্রিক ভূরাজনীতি স্তব্ধ হয়ে যায় না। তালপট্টির ইতিহাস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে–বঙ্গোপসাগরের প্রতিটি নদীমোহনা, দ্বীপ, চরাঞ্চল, উপকূলরেখা এবং সমুদ্রের স্রোতধারার সঙ্গে কীভাবে রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকার যুক্ত থাকে।

১৯৪৭ সালের র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ডে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের সীমানা নির্ধারণের সময় খুলনা ও ২৪ পরগনার দক্ষিণাঞ্চলীয় সীমান্ত বঙ্গোপসাগরে মিলিত হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। ১৯২৫ সালের এক প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তিতেও হাড়িয়াভাঙ্গা ও রাইমঙ্গলসহ সংশ্লিষ্ট নদীগুলোর মধ্যস্রোতকে সীমানা নির্ধারণের মূল ভিত্তি ধরা হয়েছিল। ২০১৪ সালের ট্রাইব্যুনালকে শেষ পর্যন্ত এই ঐতিহাসিক দলিলগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেই স্থলসীমার শেষ বিন্দু (Land Boundary Terminus) নির্ধারণ করতে হয়।

ট্রাইব্যুনাল সেই বিন্দুর ভৌগোলিক অবস্থান নির্ধারণ করে ২১°৩৮′৪০.২″ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°০৯′২০″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে। সেখান থেকেই মূলত সমুদ্রসীমা নির্ধারণের রেখা টানা শুরু হয়। এটি নিছক মানচিত্রের কোনো জ্যামিতিক হিসাব ছিল না; এই একক বিন্দু ও সেখান থেকে প্রসারিত রেখাটির ওপর নির্ভর করছিল বঙ্গোপসাগরের বিপুল সমুদ্রসম্পদের ওপর বাংলাদেশের একচ্ছত্র অধিকার।

বাংলাদেশের 'হার'–নাকি অসম্পূর্ণ বিজয়?

২০১৪ সালের আন্তর্জাতিক রায় নিয়ে বাংলাদেশে দুটি বিপরীতমুখী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছিল: ১. একপক্ষের দাবি: এটি বাংলাদেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক ও অভূতপূর্ব বিজয়। ২. অন্যপক্ষের দাবি: বাংলাদেশ তার ন্যায্য সমুদ্রাঞ্চলের একটি বড় অংশ হারিয়েছে এবং ভারতই এতে বেশি লাভবান হয়েছে।

বাস্তবমুখী বিশ্লেষণের খাতিরে এই দুটি মতবাদের কোনোটিকেই একক সত্য হিসেবে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। সংখ্যার বিচারে বাংলাদেশ বিরোধপূর্ণ অঞ্চলের প্রায় ৭৬ শতাংশ (১৯,৪৬৭ বর্গকিলোমিটার) অর্জন করেছিল। তাছাড়া আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের এই রায় উভয় দেশের জন্যই চূড়ান্ত ও বাধ্যবাধকতাযুক্ত ছিল, যেখানে আপিলের সাধারণ কোনো সুযোগ ছিল না।

অতএব, 'বাংলাদেশ সব হারিয়েছে' বলা যেমন বাস্তবতাবহির্ভূত, তেমনি 'বাংলাদেশ সব পেয়ে গেছে' দাবি করাও চরম অতিরঞ্জন।

প্রকৃত প্রশ্ন হলো:

বাংলাদেশ যে ১৯,৪৬৭ বর্গকিলোমিটার এলাকা পেয়েছে, তার কৌশলগত ও অর্থনৈতিক মূল্য কতখানি?

আর যে অঞ্চলটি বাংলাদেশ পায়নি, তার ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব কতটা ছিল?

সবচেয়ে বড় বিষয়–মামলা পরিচালনায় ব্যবহৃত প্রমাণ, আইনি কৌশল, সমুদ্রবিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য, ঐতিহাসিক মানচিত্রের ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক আইনগত প্রস্তুতির দিক থেকে বাংলাদেশের সক্ষমতা কতটুকু সন্তোষজনক ছিল?

'তিন ভারতীয় বিচারক'–একটি বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা

২০১৪ সালের রায় নিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রায়ই একটি অভিযোগ ওঠে–ট্রাইব্যুনালে ভারতের তিনজন বিচারক ছিলেন, অথচ বাংলাদেশের কোনো প্রতিনিধি ছিলেন না। আন্তর্জাতিক বিচারব্যবস্থার কাঠামোর সঙ্গে এই বক্তব্য মিলিয়ে দেখলে এর ভুলটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আন্তর্জাতিক সালিশি ট্রাইব্যুনালের সদস্যরা নির্দিষ্ট কোনো রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করেন না; তারা আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনের আলোকে স্বাধীনভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি করেন। ২০১৪ সালের পাঁচ সদস্যের ট্রাইব্যুনালে ভারতীয় সালিশকার ড. পি. এস. রাও বরং মূল রায়ের কিছু অংশে অসম্মতি জানিয়ে ভিন্নমত (Dissenting Opinion) পোষণ করেছিলেন; অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ চারজন বিচারকের দেওয়া সিদ্ধান্তেই রায় চূড়ান্ত হয়।

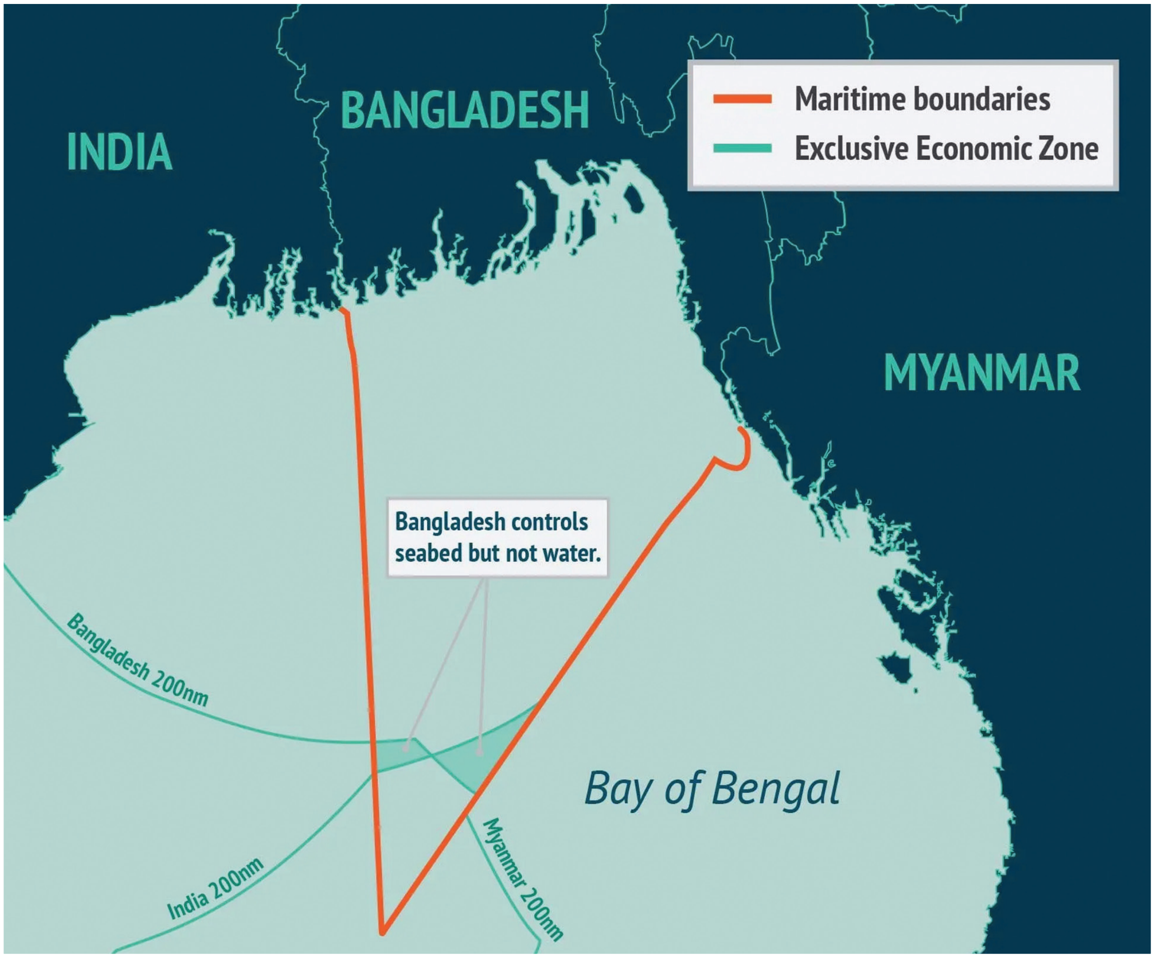

কাজেই 'ভারতের তিনজন বিচারক থাকায় বাংলাদেশ হেরে গেছে'—এই সরলীকরণ আইনি ও তথ্যগতভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

তবে এখান থেকে বাংলাদেশের জন্য একটি গভীর শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। আন্তর্জাতিক আদালতে জাতীয় স্বার্থ সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে কেবল রাজনৈতিক বক্তব্য নয়, প্রয়োজন নিখুঁত আইনি যুক্তি ও তথ্যের শক্তি। এর জন্য আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন বিশেষজ্ঞ, হাইড্রোগ্রাফার, সমুদ্রবিজ্ঞানী, ভৌগোলিক, নৌ-কৌশলী, ইতিহাসবিদ এবং আন্তর্জাতিক মানের আইনজীবীদের সমন্বয়ে একটি পেশাদার স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা গড়ে তোলা জরুরি।

হাড়িয়াভাঙ্গার মধ্যস্রোত: একটি রেখার পেছনের ভূরাজনীতি

২০১৪ সালের মামলার অন্যতম মূল বিতর্ক ছিল স্থলসীমার শেষ বিন্দু (Land Boundary Terminus) কোথায় নির্ধারিত হবে। বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশই র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ড এবং ১৯২৫ সালের বিজ্ঞপ্তির ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিল।

ট্রাইব্যুনাল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় যে ১৯৪৭ সালের হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মূল চ্যানেলের মধ্যস্রোতকে ভিত্তি ধরেই স্থলসীমার শেষ বিন্দু চিহ্নিত করতে হবে। এরপর সেই বিন্দু থেকে ১২ নটিক্যাল মাইলের একটি রেখা টানার পর পরবর্তী সমুদ্রসীমা নির্ধারণের কাজ করা হয়।

এখানে একটি মৌলিক শিক্ষা রয়েছে—রাষ্ট্রের সমুদ্রসীমার ইতিহাস সমুদ্র থেকে শুরু হয় না; এর শেকড় থাকে স্থলসীমা, নদীপথের পরিবর্তন, পুরনো মানচিত্র, ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক দলিল এবং বহুবছরের ভূগোলে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাংলাদেশ যদি বঙ্গোপসাগর নিয়ে কোনো নতুন কৌশল বা সমুদ্রসম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চায়, তবে এই ঐতিহাসিক দলিলভাণ্ডারকে আধুনিক উপায়ে ডিজিটাল ও বৈজ্ঞানিকভাবে সংরক্ষণ করা অপরিহার্য।

শেখ হাসিনা সরকারের রাজনৈতিক বয়ান

২০১৪ সালের রায়ের পর তৎকালীন শেখ হাসিনা সরকার এটিকে তাদের অন্যতম বড় কূটনৈতিক সাফল্য হিসেবে প্রচার

করে। এমনকি রাজনৈতিক বক্তব্যে দাবি করা হয়েছিল—নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও সরকারের ধারাবাহিকতা না থাকলে এই সমুদ্রসীমা জয় সম্ভব হতো না।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। একটি সরকারের রাজনৈতিক বৈধতা বা শাসনব্যবস্থা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে; কিন্তু আন্তর্জাতিক আদালতের কোনো ঐতিহাসিক রায়কে কেবল তৎকালীন সরকারের রাজনৈতিক চশমা দিয়ে মূল্যায়ন করলে তার আইনি ও কৌশলগত দিকগুলো ঢাকা পড়ে যায়।

একইভাবে, সরকার যদি কোনো আন্তর্জাতিক রায়কে নিজস্ব রাজনৈতিক সাফল্য হিসেবে দাবি করে, তবে জনগণেরও জানার পূর্ণ অধিকার থাকে—মামলাটির প্রস্তুতি কীভাবে নেওয়া হয়েছিল, কী পরিমাণ এলাকা দাবি করা হয়েছিল, কী প্রমাণ পেশ করা হয়েছিল এবং কোন দাবিগুলো ট্রাইব্যুনালে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। সামুদ্রিক সম্পদের মতো জাতীয় স্বার্থের বিষয়ে সরকারের অর্জন বা ব্যর্থতা—উভয়ই তথ্য ও নথির ভিত্তিতে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়িত হওয়া উচিত।

মূল ব্যর্থতা কি রায়ে, নাকি রায়-পরবর্তী পদক্ষেপে?

প্রকৃতপক্ষে মূল প্রশ্নটি ২০১৪ সালের রায় নিয়ে নয়; বরং রায় পাওয়ার পর বাংলাদেশ কী পদক্ষেপ নিয়েছে—সেটিই আসল প্রশ্ন।

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুই ধাপে বঙ্গোপসাগরে তার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে—২০১২ সালে মিয়ানমারের সঙ্গে এবং ২০১৪ সালে ভারতের সঙ্গে। এর মাধ্যমে প্রায় ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার সামুদ্রিক এলাকা, ২০০ নটিক্যাল মাইলের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (EEZ) এবং মহীসোপানে বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার আইনগতভাবে স্বীকৃত হয়।

কিন্তু এক যুগ পর আজ প্রশ্ন তোলা আবশ্যক:

এই বিশাল সমুদ্রসীমার বাস্তব সুবিধা কোথায়?

গভীর সমুদ্রে আধুনিক মৎস্য আহরণ নীতি বাস্তবায়নের গতি কতদূর?

অফশোর গ্যাস ও খনিজসম্পদ অনুসন্ধানে কার্যকর অগ্রগতি কতটুকু?

গভীর সমুদ্রবন্দর, সাবমেরিন ক্যাবল অবকাঠামো এবং নৌ-নিরাপত্তায় সমন্বিত পরিকল্পনা কতদূর বাস্তবায়িত হয়েছে?

আন্তর্জাতিক রায়ের মাধ্যমে অধিকার অর্জন করা প্রথম ধাপ; কিন্তু সেই অর্জনকে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত শক্তিতে রূপান্তর করাই মূল সফলতা। এই দ্বিতীয় ধাপে বাংলাদেশ এখনো প্রত্যাশিত লক্ষ্য থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে।

বঙ্গোপসাগর: ইন্দো-প্যাসিফিক ভূরাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু

আজকের বঙ্গোপসাগর আর ২০১৪ সালের বঙ্গোপসাগরের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ভারত তার পূর্ব উপকূল, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্র করে নতুন করে নিজস্ব সামুদ্রিক কৌশল জোরদার করেছে। চীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক পথ ও কৌশলগত সুরক্ষায় ভারত মহাসাগরে তার উপস্থিতি বৃদ্ধি করেছে। এছাড়া মিয়ানমার উপকূল, রাখাইন রাজ্য, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম—সমগ্র অঞ্চলটি এখন বৃহত্তর 'ইন্দো-প্যাসিফিক' ভূরাজনীতি ও সামরিক প্রতিযোগিতার কেন্দ্রবিন্দু।

এই ত্রিমুখী ও বহুমুখী প্রতিযোগিতার ঠিক মধ্যস্থলে বাংলাদেশের অবস্থান। চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর, কক্সবাজার উপকূল এবং বঙ্গোপসাগরের আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথ বাংলাদেশকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

কিন্তু এই সুযোগ কাজে লাগাতে হলে বাংলাদেশকে প্রথাগত 'স্থলকেন্দ্রিক' (land-centric) রাষ্ট্রচিন্তা থেকে বেরিয়ে এসে একটি প্রকৃত 'সামুদ্রিক রাষ্ট্র' (maritime state) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে হবে।

কোনো দেশের সঙ্গে সংঘাত নয়, প্রয়োজন সক্ষমতার প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশের সামুদ্রিক নীতি কোনো নির্দিষ্ট দেশের বিরুদ্ধে হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেও বাংলাদেশ তার সামুদ্রিক অধিকারের ক্ষেত্রে শতভাগ অনড় থাকতে পারে।

কূটনৈতিক বন্ধুত্বের অর্থ স্বার্থবিসর্জন দেওয়া নয়, আবার অধিকার রক্ষার অর্থও প্রতিবেশীর সঙ্গে সংঘাত নয়। আন্তর্জাতিক আইন, কার্যকর কূটনীতি, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং নিজস্ব অর্থনৈতিক ও সামরিক সক্ষমতা—এই চার মূল স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের সামুদ্রিক কৌশল গড়ে তুলতে হবে।

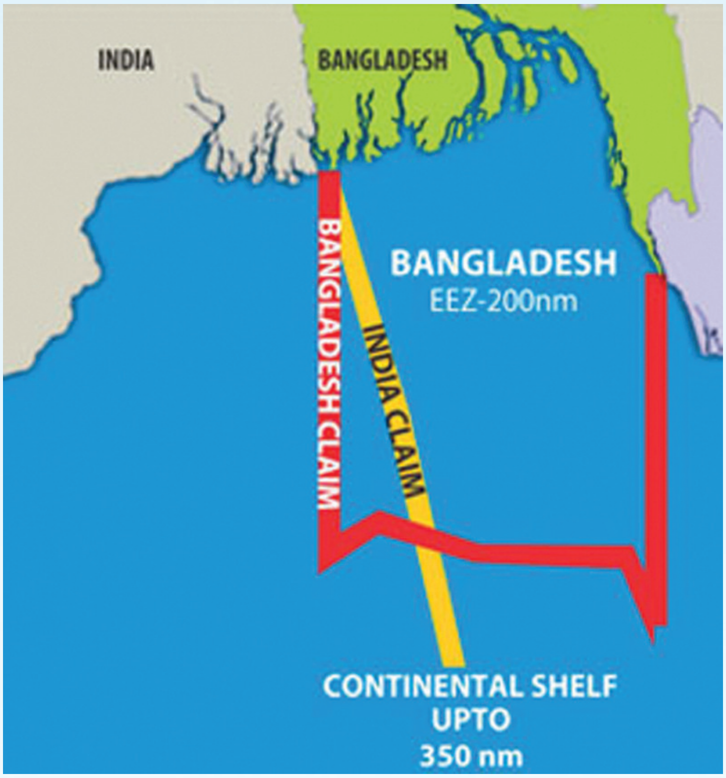

ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া কিংবা ইউরোপীয় ইউনিয়ন–সবাই বঙ্গোপসাগরকে তাদের বৈশ্বিক কৌশলের অংশ হিসেবে বিবেচনা করছে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশের নিজস্ব একটি সুদূরপ্রসারী কৌশল থাকা আবশ্যক।

২০১৪ সালের রায় কি পুনর্বিবেচনা সম্ভব?

আবেগের জায়গায় থেকে আন্তর্জাতিক আইন পরিচালিত হয় না। আন্তর্জাতিক সালিশি ট্রাইব্যুনালের ২০১৪ সালের রায় চূড়ান্ত এবং উভয় পক্ষের জন্য বাধ্যবাধকতাযুক্ত। ফলে রাজনৈতিকভাবে 'রায় বাতিলের' দাবি তোলা সহজ হলেও আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামোতে তা কার্যকর করা প্রায় অসম্ভব।

বাংলাদেশের বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ হওয়া উচিত একটি 'জাতীয় সামুদ্রিক সীমানা পর্যালোচলা' (National Maritime Boundary Review) শুরু করা।

২০১৪ সালের মূল রায়, তৎকালীন বাংলাদেশের লিখিত ও মৌখিক উপস্থাপনা, বিশেষজ্ঞদের মতামত, হাইড্রোগ্রাফিক ডেটা ও মানচিত্র নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ও দেশীয় আইন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পুনর্মূল্যায়ন করা যেতে পারে। যদি কোনো বড় ধরনের আইনি বা পদ্ধতিগত ত্রুটি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়, কেবল তখনই আন্তর্জাতিক আইনের কাঠামোর ভেতরে পরবর্তী পদক্ষেপের কথা চিন্তা করা যেতে পারে।

তবে এর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বাস্তব সত্য উদঘাটন করা–যা ভবিষ্যতে যেকোনো সামুদ্রিক চুক্তি ও নীতির ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে।

এখন সময় 'জাতীয় মেরিটাইম ডকট্রিন' প্রণয়নের

বাংলাদেশের এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন একটি সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবভিত্তিক 'জাতীয় মেরিটাইম ডকট্রিন' (National Maritime Doctrine)।

এই ডকট্রিনে প্রধানত ১০টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত: ১. সমুদ্রসীমার সার্বভৌমত্ব ও সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। ২. একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (ঊউত) এবং মহীসোপানের টেকসই ব্যবস্থাপনা। ৩. গভীর সমুদ্রে আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক মৎস্যসম্পদ আহরণ। ৪. অফশোর তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও নবায়নযোগ্য সামুদ্রিক শক্তি উৎপাদন। ৫. বিশ্বমানের সমুদ্রবন্দর অবকাঠামো ও আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথ সুরক্ষা। ৬. বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের কৌশলগত সক্ষমতা বৃদ্ধি। ৭. আধুনিক সামুদ্রিক গবেষণা ও বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য ব্যাংক গঠন। ৮. সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy)-এর সম্ভাবনা কাজে লাগানো। ৯. সামুদ্রিক পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও উপকূলীয় ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ। ১০. ভারত, মিয়ানমার, চীন ও অন্যান্য বৈশ্বিক পরাশক্তির সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ সামুদ্রিক কূটনীতি।

এটি কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মেয়াদের ৫ বছরের পরিকল্পনা হওয়া উচিত নয়; এটি হতে হবে পরবর্তী ৫০ বছরের জন্য বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সামুদ্রিক রূপরেখা।

তালপট্টি হারিয়েছে; বঙ্গোপসাগর যেন না হারায়

দক্ষিণ তালপট্টি আজ ভৌগোলিকভাবে অস্তিত্বহীন; প্রকৃতি তাকে গ্রাস করেছে। কিন্তু তালপট্টির ইতিহাস বাংলাদেশের জন্য একটি চিরন্তন সতর্কবার্তা। কীভাবে একটি ছোট্ট ভৌগোলিক অংশ দুটি দেশের সামরিক উত্তেজনার কারণ হতে পারে, আবার কীভাবে তা আন্তর্জাতিক আইনি লড়াইয়ে রূপ নিতে পারে–সেই ইতিহাস আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন।

২০১৪ সালের রায়কে কেবল 'জয়' বা 'পরাজয়'–এই দুটি শব্দে সীমাবদ্ধ করা ঠিক হবে না। এটি ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি জাতীয় পরীক্ষা। বাংলাদেশ সেই পরীক্ষায় অনেক কিছু অর্জন করেছে, আবার কিছু অনুত্তরিত প্রশ্নও রেখে গেছে।

ভবিষ্যতের বাংলাদেশ কেবল নদী, সমতলভূমি আর মহাসড়কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; তাকে সমুদ্রমুখী রাষ্ট্র হতে হবে। বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের দক্ষিণের শেষ সীমানা নয়–এটি বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের প্রবেশের মূল দ্বার।

সেই দ্বার দিয়ে আসবে জ্বালানি, মৎস্যসম্পদ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও কৌশলগত আত্মমর্যাদা। কিন্তু নীতিগত দুর্বলতা, সঠিক পরিকল্পনার অভাব এবং দীর্ঘমেয়াদি দূরদর্শিতার ঘাটতি থাকলে সেই একই দ্বার দিয়ে অন্য শক্তিগুলো তাদের প্রভাব বিস্তার করবে।

কাজেই প্রশ্ন এটি নয় যে–২০১৪ সালে কে জিতেছিল বা কে হেরেছিল। মূল প্রশ্ন হলো–বাংলাদেশ কি ২০১৪ সালে অর্জিত সামুদ্রিক এলাকাকে ২০২৬ সালে এসে এক কার্যকর অর্থনৈতিক ও কৌশলগত শক্তিতে রূপান্তর করতে পেরেছে?

উত্তর যদি 'না' হয়, তবে সেটিই হবে বাংলাদেশের প্রকৃত সামুদ্রিক পরাজয়–যে পরাজয় কোনো আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল লিখে দেয়নি, তা লেখা হবে আমাদের নিজেদের অদূরদর্শিতা ও উদাসীনতায়। ■

ডিজিটাল যুগে শিশুদের সুরক্ষা: কম বয়সীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধের প্রস্তাব

ড. শাহজাহান খান
কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (কিউইউএম)

ডিজিটাল যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শৈশবকে সুরক্ষিত রাখা এখন আর কেবল অভিভাবকের ব্যক্তিগত সতর্কতার বিষয় নয়; এটি রাষ্ট্রীয় নীতি ও সার্বিক প্রশাসনিক দায়বদ্ধতার অংশ।

সমসাময়িক বিশ্বে স্মার্টফোন শিশুদের দৈনন্দিন জীবনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করা প্রযুক্তিগুলোর একটি। নিশ্চিতভাবেই আমাদের শিশুদের জন্য ইন্টারনেটের শিক্ষণীয় ও নিরাপদ কনটেন্টে অবাধ প্রবেশের অধিকার থাকা উচিত। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিক্ষা, যোগাযোগ ও নতুন বিনোদনের দুয়ার খুলে দেয়। কিন্তু এর বিপরীত দিকটি মারাত্মক–অনিয়ন্ত্রিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম শিশুদের সাইবার বুলিং, অনলাইন যৌন শোষণ, অপতথ্য, আসক্তিকর অ্যালগরিদম, জুয়া, মাদকাসক্তির প্রচার, সহিংসতা এবং ক্ষতিকর পরিচিত-পরিচিত ব্যক্তিদের চক্রের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মূল প্রশ্নটি এটা নয় যে–শিশুরা ইন্টারনেট ব্যবহার করবে কি না। বর্তমান যুগে শিক্ষা ও ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের স্বার্থে তাদের প্রয়োজনীয় ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন করতেই হবে। আসল প্রশ্ন হলো–১৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের কি সামাজিক যোগাযোগ, বাণিজ্য ও অ্যালগরিদমভিত্তিক এনগেজমেন্ট নিশ্চিত করার জন্য তৈরি প্ল্যাটফর্মগুলোতে অবাধ বা অনিয়ন্ত্রিত প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত? উত্তর পরিষ্কার–না।

অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্যের সাম্প্রতিক পথ অনুসরণ করে বাংলাদেশকেও ১৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের বড় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্মে অ্যাকাউন্ট পরিচালনা বন্ধে কঠোর আইন প্রণয়নের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

২০২৫ সালের ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার নতুন ইতিহাস

অস্ট্রেলিয়া বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে সামাজিকভাবে ১৬ বছর বয়সসীমা নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়ন করেছে। ২০২৫ সালের ১০ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হওয়া নতুন আইনের আওতায়, নির্দেশিত প্ল্যাটফর্মগুলোকে ১৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের অ্যাকাউন্ট পরিচালনা ঠেকাতে 'যুক্তিসংগত পদক্ষেপ' নিতে বাধ্য করা হয়েছে।

এই আইনের সবচেয়ে প্রশংসনীয় দিক হলো–অনলাইন নিরাপত্তার দায় শিশু বা অভিভাবকদের কাঁধে চাপানো হয়নি; বরং এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে টেক-কোম্পানিগুলোর ওপর। আইন অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে সর্বোচ্চ ৪ কোটি ৯৫ লাখ অস্ট্রেলীয় ডলার জরিমানার মুখোমুখি হতে হবে।

অস্ট্রেলিয়ার নীতিটির মূল ভিত্তি অত্যন্ত স্পষ্ট–শিশুদের এমন জটিল ও অত্যন্ত শক্তিশালী ডিজিটাল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দায়িত্ব দেওয়া অনুচিত, যা মূলত মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে সম্পৃক্ততা (engagement) বাড়ানোর জন্য বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ডিজাইন করা হয়েছে।

তবে এই আইনের অর্থ শিশুদের ইন্টারনেট থেকে বিচ্ছিন্ন করা নয়। শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট, ব্রাউজিং বা যোগাযোগের মাধ্যম তাদের জন্য খোলাই থাকছে। মূল লক্ষ্য–শিশুরা মানসিক পরিপক্বতা অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত যেন এই প্ল্যাটফর্মগুলোর ক্ষতিকর এনগেজমেন্টের শিকার না হয়।

অস্ট্রেলিয়ার পথ ধরছে যুক্তরাজ্য

যুক্তরাজ্যও এখন এ বিষয়ে আরও কঠোর পদক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছে। ব্রিটিশ সরকার জানিয়েছে, ১৬ বছরের কম বয়সীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে আইনি বিধিনিষেধ আনা হচ্ছে, যা ২০২৭ সালের বসন্ত থেকে কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে।

নিউজিল্যান্ডসহ আরও কয়েকটি দেশও এখন এ ধরনের বিধিনিষেধ এবং কঠোর বয়স যাচাই (Age Verification) ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করছে। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হচ্ছে–বিষয়টি কেবল দু-একটি দেশের একক চিন্তা নয়, বরং এটি এখন আন্তর্জাতিক উদ্বেগে রূপ নিয়েছে।

বাংলাদেশের কেন এখনই পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন?

আমাদের শিশুদের এমন এক স্বাভাবিক পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিতে হবে, যেখানে অতিরিক্ত স্ক্রিন কিংবা প্রক্রিয়াজাত উপাদানের আগ্রাসন থাকবে না; বরং নীতি-নৈতিকতা, মানসিক বিকাশ ও শারীরিক সুস্থতা প্রাধান্য পাবে।

বাংলাদেশের অনেক শিশু ইতোমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গভীরভাবে আসক্ত হয়ে পড়ছে, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে তাদের পড়াশোনা এবং শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্যে। সময়ের অভাব কিংবা কারিগরি জ্ঞান না থাকায় বেশিরভাগ অভিভাবক সন্তানদের অনলাইন কার্যক্রম তদারকি করতে পারেন না। ফলে অনেক শিশু অজান্তেই অনলাইন জুয়া, যৌন শোষণ বা মাদক সংক্রান্ত চক্রের মতো বিপজ্জনক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে।

ইউনিসেফের (UNICEF) একাধিক গবেষণা বাংলাদেশের শিশুদের অনলাইন ঝুঁকি সম্পর্কে আমাদের চমকে ওঠার মতো তথ্য দিয়েছে:

৬৩% শিশু নিজেদের শোবার ঘরে একাকী ইন্টারনেট ব্যবহার করে, ফলে অভিভাবকদের পক্ষে তদারকি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ইউনিসেফের এক জরিপে দেখা গেছে, ৩২% শিশু চেহারার ধরন, পরীক্ষার ফলাফল বা ধর্ম নিয়ে অনলাইনে সাইবার বুলিংয়ের শিকার হয়েছে।

২০২৫ সালে প্রকাশিত ইউনিসেফের একটি যুব জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশের প্রতি তিনজন তরুণের মধ্যে দুজন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়া খবর ও অপতথ্যকে মানসিক চাপের প্রধান কারণ বলে মনে করেন।

এছাড়া, প্রতি সাতজনের একজন ক্ষতিকর বা মানসিকভাবে কষ্টদায়ক কনটেন্টকে তাদের মানসিক উদ্বেগের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

এসব তথ্য প্রমাণ করে যে, বিশ্বজুড়ে শিশুদের ওপর প্রযুক্তির যে ক্ষতিকর প্রভাব দেখা যাচ্ছে, তা থেকে বাংলাদেশের শিশুরা কোনোভাবেই সুরক্ষিত নয়।

ক্ষতিকর দিক কেবল বুলিংয়ে সীমাবদ্ধ নয়

সাইবার বুলিং সমস্যার একটি অংশমাত্র। অনলাইনে শিশুরা যৌন প্রলোভন, গোপন ছবি দাবি, ডিজিটাল ব্ল্যাকমেইলিং

এবং ফটো-ভিত্তিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এর পাশাপাশি ঘৃণাত্মক বক্তব্য, উগ্রবাদ, অসাধু অনলাইন চ্যালেঞ্জ এবং এমন অ্যালগরিদম রয়েছে, যা শিশুকে ধীরে ধীরে চরমপন্থী বা ক্ষতিকর কনটেন্টের দিকে ধাবিত করে।

একই সঙ্গে অতিরিক্ত স্ক্রিন-টাইম কাটার ফলে শিশুদের স্বাভাবিক ঘুম, পড়াশোনা, শারীরিক খেলাধুলা ও পারিবারিক বন্ধন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সম্প্রতি ইউনিসেফের এক বৈশ্বিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২১টি দেশের প্রায় ২ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী শিশু এক বছরে অনলাইনে যৌন শোষণ বা নির্যাতনের শিকার হয়েছে। আর এসব ঘটনার বড় অংশ ঘটেছে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, স্ন্যাপচ্যাট ও টিকটকের মতো জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মগুলোতে।

ন্যূনতম বয়স ১৬ কেন?

অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন—১৩ বা ১৫ নয় কেন? ১৬ বছর কোনো ম্যাজিক নম্বর নয়, যা পার হলেই একজন হঠাৎ সম্পূর্ণ পরিপক্ব হয়ে যাবে। তবে এটি একটি সর্বজনগ্রাহ্য নীতিগত সীমা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যালগরিদমিক সুপারিশ, সামাজিক তুলনা, নোটিফিকেশনের অবিরাম চাপ এবং প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করার মানসিক পরিপক্বতা সাধারণত কিশোর বয়সের শুরুতে থাকে না। তাই এই বয়সসীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্য ১৫ বছর বয়সী কাউকে 'প্রযুক্তি ব্যবহারে অক্ষম' বলা নয়; বরং বাণিজ্যিক ও সামাজিক চাপের মুক্ত এক নিরাপদ শৈশব উপহার দেওয়া।

সম্পূর্ণ দায় অভিভাবকদের ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না

অনেকের মতে, সন্তান কী করবে তা তদারকির দায়িত্ব অভিভাবকদের। অভিভাবকদের ভূমিকা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু কোটি ডলার বিনিয়োগে তৈরি প্রযুক্তি জায়ান্টদের মনস্তাত্ত্বিক কৌশলের বিরুদ্ধে একা লড়াই করা একজন সাধারণ অভিভাবকের পক্ষে অসম্ভব।

অভিভাবক হয়তো সন্তানকে আধঘণ্টা ব্যবহারের অনুমতি দেন, কিন্তু অ্যাপের অ্যালগরিদম সারারাত নোটিফিকেশন পাঠিয়ে তাকে ব্যস্ত রাখতে চায়। অভিভাবক একটি ক্ষতিকর অ্যাকাউন্ট ব্লক করলেও সিস্টেম আরও ১০০টি নতুন সাজেশন নিয়ে হাজির হয়। তাই প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে সরকারি ও আইনি হস্তক্ষেপের কোনো বিকল্প নেই।

'ইন্টারনেট নিষেধাজ্ঞা' নয়, প্রয়োজন বিচক্ষণ বিধিনিষেধ

তবে বাংলাদেশকে একটি বিষয় সতর্কভাবে খেয়াল রাখতে হবে—এই সিদ্ধান্ত যেন ঢালাওভাবে শিশুদের ইন্টারনেট বা তথ্যপ্রযুক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন না করে ফেলে। বিদ্যালয়গুলোতে কম্পিউটার শিক্ষা ও ডিজিটাল সাক্ষরতা চালু রাখতে হবে। শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট, তথ্য অনুসন্ধান ও যোগাযোগব্যবস্থা শিশুদের জন্য উন্মুক্তই থাকবে।

কেবল প্রকাশ্য সামাজিক যোগাযোগ, অ্যালগরিদমভিত্তিক নিউজফিড ও অচেনা মানুষের সঙ্গে উন্মুক্ত যোগাযোগের সুবিধা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্মগুলোতেই অ্যাকাউন্ট তৈরির বয়সসীমা ১৬ করা উচিত।

আইন হতে হবে প্রযুক্তি কোম্পানির বিরুদ্ধে, শিশুদের বিরুদ্ধে নয়

এক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার মডেল থেকে শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে। মূল আইনি দায়ভার থাকবে প্ল্যাটফর্মগুলোর ওপর—শিশুদের ওপর নয়।

কোনো শিশু বয়স লুকিয়ে অ্যাকাউন্ট খুললে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা বা জরিমানা করা যাবে না; এমনকি অভিভাবকদেরও অভিযুক্ত করা যাবে না। বরং বয়স যাচাইয়ের আধুনিক ব্যবস্থা তৈরি না করা এবং অসচ্ছলতার সুযোগ দেওয়ার অপরাধে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে বিশাল অঙ্কের জরিমানা আরোপ করতে হবে।

একই সঙ্গে বয়স যাচাইয়ের প্রক্রিয়ায় জাতীয় পরিচয়পত্র বা বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাইভেসির বিষয়টি কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে, যাতে শিশুদের অতিরিক্ত ডেটা বা তথ্য সংগ্রহ করা না হয়।

সময় এসেছে জাতীয় 'শিশু ডিজিটাল নিরাপত্তা কাঠামো' প্রণয়নের

বাংলাদেশের অবিলম্বে একটি জাতীয় শিশু ডিজিটাল নিরাপত্তা কাঠামো (National Child Digital Safety Framework) গঠন করা উচিত। এর অধীনে: ১. প্রধান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য নতুন অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ বন্ধের আইনি বাধ্যবাধকতা প্রবর্তন করা। ২. আইন অমান্যকারী প্ল্যাটফর্মের জন্য বড় অঙ্কের জরিমানার ব্যবস্থা করা। ৩. ডিজিটাল নাগরিকত্ব, ভুল তথ্য শনাক্তকরণ ও অনলাইনের সঠিক ব্যবহারের বিষয়গুলো স্কুলের পাঠ্যক্রমে যুক্ত করা। ৪. অভিভাবকদের জন্য সন্তানকে নিরাপদে ডিজিটালি পরিচালিত করার গাইডলাইন প্রদান করা। ৫. একটি স্বাধীন ও ক্ষমতাসম্পন্ন 'ডিজিটাল নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রক সংস্থা' গড়ে তোলা বা বিদ্যমান সংস্থাকে আরও শক্তিশালী করা।

দুর্ঘটনা বা সংকটের জন্য অপেক্ষা করা অনুচিত

অনেক রাষ্ট্রই কোনো বড় দুর্যোগের পর ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু বাংলাদেশের উচিত আগাম সতর্কতার নীতি গ্রহণ করা।

আমাদের শিশুরা যে ইতিমধ্যেই অনলাইন জগতে অনিরাপদ—ইউনিসেফের ডেটা ও সামাজিক বাস্তবতাই তার বড় প্রমাণ। আরও হাজার হাজার শিশুর জীবন ও মানসিক স্বাস্থ্য বিপন্ন হওয়ার আগে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।

প্রযুক্তির নিজস্ব কোনো দোষ নেই; তবে প্রযুক্তির দায়িত্ব শৈশবের সেবা করা, শৈশবকে প্রযুক্তির দাসে পরিণত করা নয়। ১৬ বছরের বয়সসীমা হয়তো এক দিনে সব সমস্যা সমাধান করবে না, তবে এটি আমাদের শিশুদের জন্য একটি সুরক্ষিত, সুস্থ ও স্বাভাবিক শৈশব উপহার দেওয়ার পথে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হবে। ■

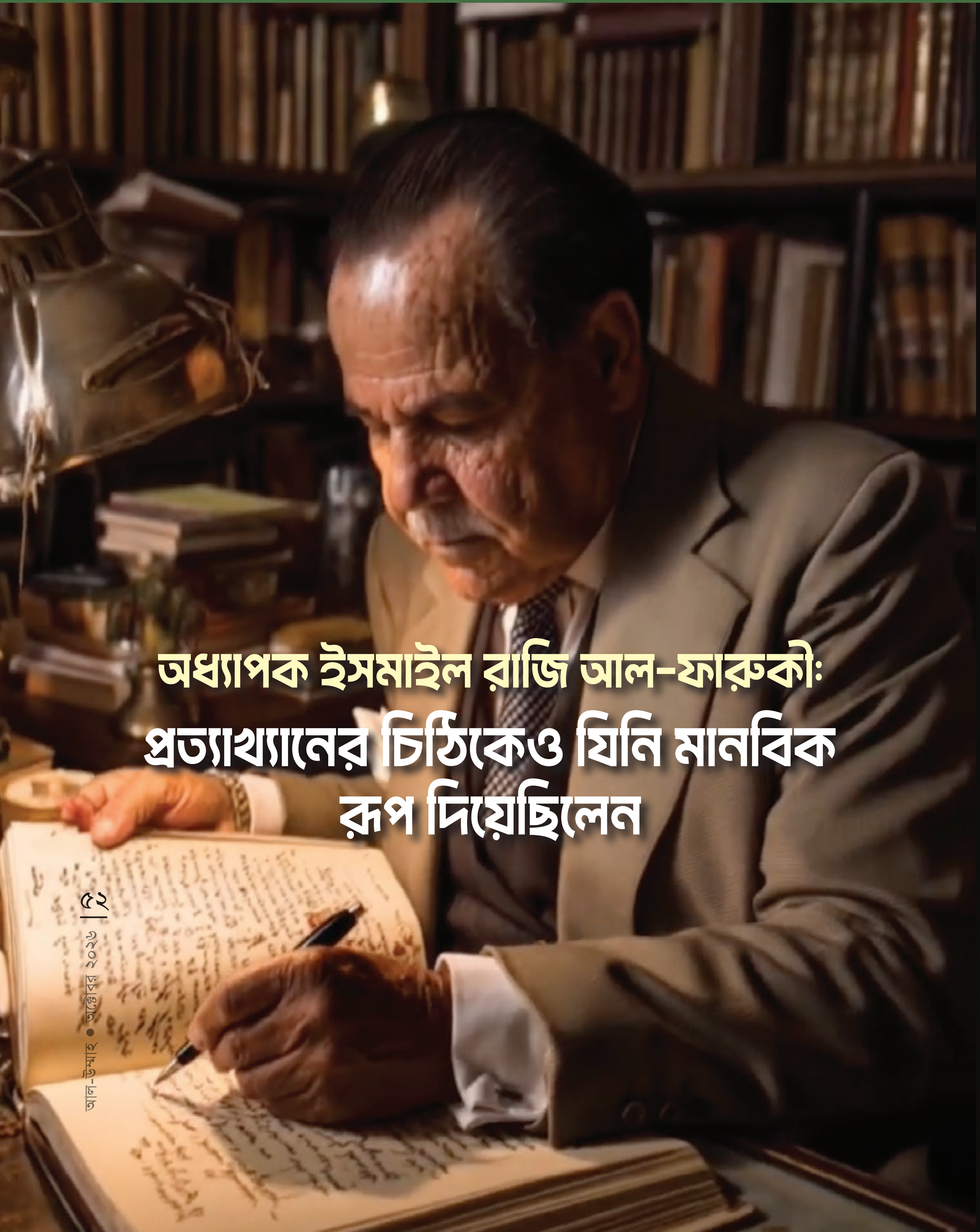

অধ্যাপক ইসমাইল রাজি আল-ফারুকী: প্রত্যাখ্যানের চিঠিকেও যিনি মানবিক রূপ দিয়েছিলেন

গোলাম নবী ফাই, পিএইচডি

মহাসচিব, ওয়ার্ল্ড কাশ্মীর অ্যাওয়ারনেস ফোরাম

অধ্যাপক ইসমাইল রাজি আল-ফারুকী আমাকে যে শিক্ষাটি দিয়েছিলেন–এবং যা আমার হৃদয়ে সবচেয়ে গভীরভাবে গেঁথে আছে–তা কোনো প্রথাগত ক্লাসরুমে শেখানো হয়নি।

ঘটনাটি ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ের। ফিলাডেলফিয়ার টেম্পল ইউনিভার্সিটিতে তিনি ছিলেন আমার শিক্ষক ও একাডেমিক উপদেষ্টা। ওই একই সময়ে তিনি ভার্জিনিয়াভিত্তিক 'ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট' (IIIT) প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। প্রতিষ্ঠানটি থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তির সুযোগ ঘোষণা করা হলে অধ্যাপক আল-ফারুকী আমাকে পাকিস্তানি ও কাশ্মীরি সংবাদপত্রগুলোতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে বলেন, আর তিনি নিজে আরবি প্রকাশনাগুলোতে বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করেন।

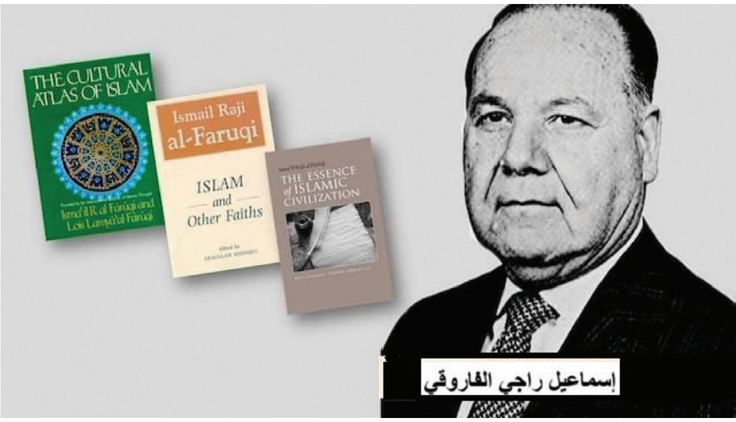

কয়েকদিনের মধ্যে শত শত আবেদন জমা পড়তে শুরু করল। একদিন তিনি আমাকে নিজের দপ্তরে ডেকে বললেন, "গোলাম, প্রচুর আবেদন এসেছে, যার মধ্যে কাশ্মীর থেকেও বেশ কয়েকটি রয়েছে। এদের অনেকেই স্নাতক (আন্ডারগ্রাজুয়েট) পর্যায়ের শিক্ষার্থী; কিন্তু আমাদের এই বৃত্তিটি কেবল স্নাতকোত্তর (গ্রাজুয়েট) গবেষণার জন্য নির্ধারিত। তা ছাড়া আমাদের দেওয়ার মতো বৃত্তি আছে মাত্র ৫০টি।"

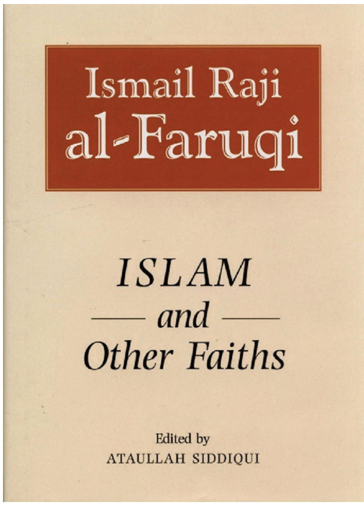

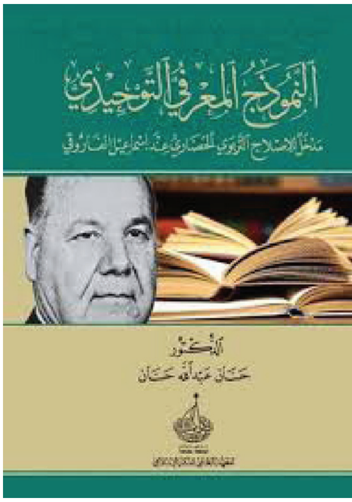

একটু থেমে, মুখে অমায়িক হাসি ফুটিয়ে তিনি যোগ করলেন, "আমি এই তরুণ মুসলিম শিক্ষার্থীদের মন ভাঙতে চাই না। আমি যখন তাদের প্রত্যাখ্যানের চিঠি পাঠাব, তাতে 'এক টন চিনি' মিশিয়ে দেব–যেন লেখাটি অত্যন্ত মিষ্টি ও সান্ত্বনাদায়ক হয়।" এমনই ছিল আল-ফারুকীর হৃদয়স্পর্শী মানবিকতা।

চলতি সপ্তাহে স্মৃতিটি নতুন করে জাগ্রত হলো, যখন ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ওয়াশিংটনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। অন্যান্য তরুণ গবেষকদের মতোই তিনি অধ্যাপক আল-ফারুকীর কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক অবদানই নয়, বরং মানুষ আল-ফারুকী কেমন ছিলেন, তা জানতে উৎসুক ছিলেন। আমাদের সেই আলোচনা আমাকে আবারও অনুধাবন করালো–অনেকে তাঁর বই ও ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হলেও তাঁর এই অসাধারণ ও বিরল মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে খুব কম মানুষই জানেন।

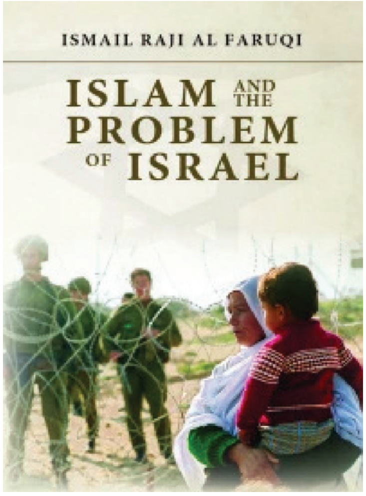

উত্তর আমেরিকায় আধুনিক ইসলামিক স্টাডিজের ভিত গড়ে তোলার অন্যতম অগ্রদূত হিসেবে অধ্যাপক ইসমাইল রাজি আল-ফারুকী সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর গবেষণা ও পাণ্ডিত্য এমন এক ইসলামি বিশ্ববীক্ষা তৈরি করতে চেয়েছিল, যা আধুনিক

জ্ঞানের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক সংলাপে সক্ষম এবং একই সঙ্গে নিজের মৌলিক ধর্মীয় চেতনার প্রতি অনুগত। তিনি মুসলমানদের নিজ নিজ বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও সমালোচনামূলক মূল্যায়নের আহ্বান জানান, পাশাপাশি বিশ্বসভ্যতায় ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান মূল্যায়নে অমুসলিমদের উৎসাহিত করেন।

তবে তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান অবদান হয়তো কেবল তাঁর রচিত বইপত্রের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা বেঁচে আছে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সেই হাজার হাজার শিক্ষার্থীর মাঝে, যাদের জীবন তিনি বদলে দিয়েছিলেন।

আল-ফারুকীর কাছে 'মুসলিম স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন' (MSA) কেবল একটি সাধারণ ক্যাম্পাস সংগঠন ছিল না; এটি ছিল বর্ণ, জাতি ও জাতীয়তার উর্ধ্বের এক বৈশ্বিক 'উম্মাহর' বাস্তব রূপক। টেম্পল ইউনিভার্সিটিতে–যেখানে ৪০টি দেশের প্রায় সাড়ে ৩০০ মুসলিম শিক্ষার্থী একসঙ্গে পড়াশোনা করত–তিনি আমাদের জাতীয় পরিচয়ের সঙ্কীর্ণ বিভাজন প্রত্যাখ্যান করে একটি ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায় গড়ে তোলার তাগিদ দিতেন।

তাঁর প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএসএ একটি শক্তিশালী সংগঠনে রূপ নেয়। তাঁরই তত্ত্বাবধানে সংগঠনটির প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যাতে বর্তমানে মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির (IIUM) রেক্টর অধ্যাপক ওসমান বাকর সভাপতি এবং আমি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হই। তিনি আমাদের উন্মুক্ত গণবক্তৃতার আয়োজন করতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হতে এবং ক্যাম্পাসজীবনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে উৎসাহিত করতেন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বের ফলেই টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএসএ একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত সংগঠনে পরিণত হয়।

কয়েক বছর পর, যখন আমি যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাভিত্তিক কেন্দ্রীয় এমএসএ-র সভাপতির দায়িত্ব পাই, তখন আল-ফারুকীর এই দর্শনের গভীরতা রূপায়িত হতে দেখেছি। উত্তর আমেরিকাজুড়ে এমএসএ-র শাখাগুলো বিমানবন্দরে নতুন আগত আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাত, তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিত এবং ব্যক্তিস্বার্থের বদলে সেবাধর্মী মানসিকতা দিয়ে একটি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তুলত। এসবই ছিল আল-ফারুকীর মূল বিশ্বাসের প্রতিফলন–যেখানে জ্ঞানচর্চা ও নৈতিক চরিত্র সব সময় হাত ধরাধরি করে চলে।

তাঁর বসতবাড়িটি ছিল মূলত শ্রেণিকক্ষের বাইরে আরেকটি শিখনকেন্দ্র। সহধর্মিনী ড. লামিয়া আল-ফারুকীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রায়ই শিক্ষার্থীদের নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতেন। তাঁদের নৈশভোজ ও পিকনিকগুলো কেবল সুস্বাদু খাবারের জন্যই নয়, বরং সেখানে প্রদর্শিত আন্তরিকতার জন্যও স্মরণীয় হয়ে থাকত। তাঁদের কাছে আতিথেয়তা কোনো আনুষ্ঠানিক সামাজিকতা ছিল না; এটি ছিল ঈমানি দায়িত্ব ও বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ।

আইআইআইটি (IIIT)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ড. আহমেদ তোতোনজি একবার মন্তব্য করেছিলেন, "আল-ফারুকী আপনার কথা এমন গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, যেন আপনিই তাঁর শিক্ষক!" এই বিরল বিনয় ও নম্রতাই ব্যাখ্যা করে–কেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম শিক্ষার্থীরা তাঁর মেধার পাশাপাশি তাঁর চরিত্রের প্রতি এতটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

তাঁর প্রভাব টেম্পল ইউনিভার্সিটির গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। অধ্যাপক ইমতিয়াজ ইউসুফ, অধ্যাপক ওসমান বকর, অধ্যাপক মো. সালেহ ইয়াপার এবং অধ্যাপক জন এল. এস্পোসিটোর মতো আন্তর্জাতিক একাডেমিক ব্যক্তিত্বরা তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিক যাত্রায় আল-ফারুকীর প্রভাবের কথা গভীর কৃতজ্ঞতায় স্বীকার করেছেন।

অধ্যাপক এস্পোসিটো তাঁর একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন, “অধ্যাপক আল-ফারুকী আন্তঃধর্মীয় সংলাপে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের মধ্যকার অর্থপূর্ণ আলোচনাকে কোনো রাজনৈতিক আপস মনে করতেন না; বরং একে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে দেখতেন। এমন এক সময়ে—যখন ধর্মীয় মেরুকরণ চারপাশের সামাজিক আলোচনাকে গ্রাস করছে—শ্রদ্ধাপূর্ণ ও যুক্তিনির্ভর সংলাপের প্রতি তাঁর এই প্রতিশ্রুতি আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।”

আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ার (IIUM) রেক্টর অধ্যাপক ওসমান বকর বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সংলাপ প্রতিষ্ঠায় আল-ফারুকীর ঐতিহাসিক প্রচেষ্টার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। আধুনিক জ্ঞানের সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী ইসলামি শিক্ষার সমন্বয় সাধনে (Islamization of Knowledge) আল-ফারুকীকে তিনি ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক পুনর্জাগরণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গণ্য করতেন।

একইভাবে তাঁর অনুরাগী ছাত্র অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ ইউসুফ তাঁকে “একজন বীর বুদ্ধিজীবী এবং ইসলামের চলন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া” হিসেবে অভিহিত করেছেন, যিনি ধর্মের তুলনামূলক অধ্যয়ন (Phenomenology of Religion) ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন।

১৯৮৬ সালে অধ্যাপক আল-ফারুকী ও ড. লামিয়া আল-ফারুকীর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড এই দুই মহান প্রজ্ঞাবান মানুষের জীবনপ্রদীপ সাময়িকভাবে নিভিয়ে দিয়েছিল সত্য; কিন্তু তাঁদের প্রতিষ্ঠিত দর্শন নিভে যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুম, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং তাঁদের শত শত শিক্ষার্থীর কর্মে সেই কাজের উত্তরাধিকার আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আজ যখন আমি অধ্যাপক আল-ফারুকীর কথা ভাবি, তখন তাঁর বহু আন্তর্জাতিক খ্যাতির কথা ছাপিয়ে আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একজন মহান শিক্ষকের প্রতিকৃতি—যিনি বৃত্তি না পাওয়া অনুজ গবেষক ও শিক্ষার্থীদের মন ভাঙার বেদনায় ব্যথিত হতেন এবং প্রত্যাখ্যানের চিঠিতেও এক টুকরো ভালোবাসার মিষ্টতা মিশিয়ে দিতেন।

যে যুগে প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের জয়গান গাইতে গিয়ে মানুষের অনুভূতিকে উপেক্ষা করা হয়, সেখানে দয়া ও মানবিকতার এই শিক্ষাটিই হয়তো আমাদের জন্য তাঁর রেখে যাওয়া সবচেয়ে বড় আমানত।

মহান আল্লাহ আল-ফারুকী দম্পতিকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন। আমিন। ■

ডিজিটাল ক্যাশ:

ব্যবসার জন্য নিরাপদ ও সুবিধাজনক পেমেন্ট ব্যবস্থা

প্রাপ্য বিলের (receivables) বিপরীতে প্রস্তাবিত একটি ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে বাকিতে কেনাকাটা মেটাতে, সরবরাহ শৃঙ্খলে (supply chain) অর্থপ্রবাহ ও মান বজায় রাখতে এবং ব্যয়বহুল স্বল্পমেয়াদী ঋণের ওপর নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করতে পারে।

মো: মশিউর রহমান
ব্যাংকার ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষক
mashiur.du@gmail.com

ডিজিটাল ক্যাশ (dCash) হলো স্বল্পমেয়াদী অর্থায়নে সহায়তার জন্য প্রাপ্য বিলের বিপরীতে ইস্যুকৃত একটি প্রস্তাবিত ডিজিটাল পেমেন্ট মাধ্যম, যা সাধারণত ৩০ থেকে ১২০ দিন এবং সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত মেয়াদের জন্য প্রযোজ্য। এটি ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ফিনটেক কোম্পানিগুলোর ইস্যু করা ডিজিটাল ইউনিট ব্যবহার করে ক্রেতাদের অর্থ পরিশোধের সুযোগ দিয়ে পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয়ে সুবিধা প্রদান করবে। মূলত বাকিতে বিক্রি থেকে সৃষ্ট অর্থ পরিশোধের জন্য পরিকল্পিত এই dCash বিজনেস-টু-কনজিউমার (B2C) এবং বিজনেস-টু-বিজনেস (B2B) উভয় বাজারেই নিরাপদ ও হস্তান্তরযোগ্য লেনদেনে সহায়তা করতে পারে।

ব্যবসা ধারণার বিবরণ

আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেডের মতে, বাংলাদেশে ব্যাংক এবং অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (NBFI) দেওয়া অর্থায়নসহ সাপ্লাই-চেইন ফাইন্যান্স বা সরবরাহ-শৃঙ্খল অর্থায়ন বাজারের আকার প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকা (৩২৫.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। এই বাজারের সম্প্রসারণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বিশ্বব্যাপী সাপ্লাই-চেইন ফাইন্যান্সের বাজার ২০২৫ সালের মধ্যে প্রায় ৫.৭০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হয়েছিল, যা এই খাতে উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। তবে, এক বছরের কম মেয়াদের স্বল্পমেয়াদী অর্থায়ন হওয়া সত্ত্বেও সাপ্লাই-চেইন ফাইন্যান্স প্রদানকারীরা প্রায়শই আমানত ও মূলধনের ঘাটতির সম্মুখীন হন।

এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় আমরা 'ডিজিটাল ক্যাশ' নামের একটি উদ্ভাবনী পণ্য নকশা করেছি। প্রস্তাবিত মডেলের অধীনে একটি ফিনটেক কোম্পানি, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনো গ্রাহকের পক্ষে সরবরাহকারীর (supplier) অনুকূলে ডিজিটাল ইউনিট বা পয়েন্ট ইস্যু করবে। ইউনিটগুলো একটি নির্দিষ্ট স্বল্পমেয়াদী সময়ের জন্য বৈধ থাকবে এবং এগুলো সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি মূল্যের প্রাপ্য বিল দ্বারা সমর্থিত (backed) হবে। এই সময়কালে, ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানটি প্রচলিত বার্ষিক প্রায় ১৫% হারের সাধারণ সুদের পরিবর্তে ইউনিটগুলোর ওপর প্রতি ত্রৈমাসিকে (প্রতি ৩ মাসে) সর্বোচ্চ ০.৫০% হারে সার্ভিস ফি বা সেবা মাশুল ধার্য করবে। নিচের উদাহরণটি এই ব্যবস্থাটির কার্যপদ্ধতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরে:

১০০ টাকার বাকিতে বিক্রির জন্য কোম্পানিটি ক্রেতার পক্ষে বিক্রেতাকে ১০০টি ডিজিটাল ইউনিট ইস্যু করবে। বিক্রেতা এই ইউনিটগুলো তার নিজস্ব সরবরাহকারীদের কাছে হস্তান্তর করতে পারবে, যারা পরবর্তীতে এই ব্যবস্থার মধ্যেই আরও কেনাকাটার জন্য সেগুলো ব্যবহার করতে পারবে। ঋণের মেয়াদ যদি ৯০ দিন হয়, তবে মেয়াদপূর্তিতে ইউনিটটির ধারণকারী ১০০ টাকার বিনিময়ে তা ভাঙাতে বা ক্যাশ করতে পারবে। কোম্পানিটি মূল ক্রেতার কাছ থেকে এই অর্থ উদ্ধার করবে। পণ্য অবিক্রীত থাকার কারণে ক্রেতা যদি অর্থ পরিশোধ করতে না পারে, তবে ফিনটেক কোম্পানিটি পণ্যের জামানত, পোস্ট-ডেটেড চেক, গ্যারান্টি বা অন্য কোনো অনুমোদিত নিরাপত্তার বিপরীতে অর্থায়ন প্রদান করতে পারবে।

একটি ব্লকচেইন-ভিত্তিক বা অন্যান্য নিরাপদ ডিজিটাল লেজার ব্যবস্থার মাধ্যমে লেনদেনের তথ্য রেকর্ড করবে এবং ইউনিটগুলোর স্থিতি (balance) বজায় রাখবে। প্রস্তাবিত মডেলটি উচ্চ সুদের চার্জের পরিবর্তে একটি সামান্য সার্ভিস

ফি গ্রহণের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী তারল্যের চাপ কমাতে এবং অর্থায়ন খরচ হ্রাস করতে পারে। এটি ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও সহায়তা করতে পারে। অংশগ্রহণকারী ফিনটেক কোম্পানি, ব্যাংক বা এনবিএফআই সাপ্লাই-চেইন ফাইন্যান্স প্রদানকারী এবং তাদের গ্রাহকদের জন্য প্রয়োজনীয় ডিজিটাল অবকাঠামো সরবরাহ করবে।

পণ্য ও সেবার বিবরণ

ডিজিটাল ক্যাশ (dCash) হলো ৩০ থেকে ১২০ দিন এবং সর্বোচ্চ এক বছর মেয়াদের জন্য প্রাপ্য বিলের বিপরীতে ইস্যুকৃত একটি প্রস্তাবিত হস্তান্তরযোগ্য ডিজিটাল মাধ্যম। পণ্য ও সেবার মূল্য পরিশোধ করতে ক্রেতারা ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ফিনটেক কোম্পানি থেকে ইস্যু করা ডিজিটাল ইউনিট ব্যবহার করবেন। ইস্যুকারী কোম্পানির নিয়ন্ত্রাধীন একটি নিরাপদ ব্লকচেইন-ভিত্তিক বা ডিজিটাল লেজার লেনদেনের হিসাব রাখবে এবং ব্যবস্থার অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে, ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানটি মেয়াদপূর্তির তারিখ এবং হলোগ্রাফিক সিকিউরিটি ফিচারযুক্ত শারীরিক বা পেপার ডিজিটাল-ক্যাশ নোটও চালুর উদ্যোগ নিতে পারে।

প্রতিটি ফঙ্গধংয ইউনিটে একটি মেয়াদপূর্তির তারিখ থাকবে, যা অন্তর্নিহিত প্রাপ্য বিলের সম্ভাব্য নগদ-রূপান্তর চক্রের (cash-conversion cycle) সঙ্গে যুক্ত। মূল ক্রেতা মেয়াদপূর্তিতে অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, ইস্যুকারী বা অর্থায়নকারী কোম্পানি ইউনিট ধারণকারীকে অর্থ পরিশোধ করবে এবং ক্রেতার ক্রেডিট ঝুঁকি নিজের কাঁধে নেবে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে, কোম্পানি সেই ঝুঁকি বীমাও (credit insurance) করতে পারে। এই ব্যবস্থাটি প্রধানত B2C এবং B2B উভয় বাজারের বাকিতে বিক্রি থেকে সৃষ্ট অর্থ পরিশোধের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে।

বাজার বিশ্লেষণ

বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে তারল্য সংকটের মুখোমুখি হয়ে আসছে, যেখানে কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ২৭ জুন, ২০২৪ তারিখে 'ঢাকা ট্রিবিউন'-এর একটি প্রতিবেদনে চলমান তারল্য সংকট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিল। পৃথকভাবে, ৪ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে 'ডেইলি সান'-এর এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আর্থিক অনিয়মের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ২ লাখ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে বলে হিসাব করেছেন।

প্রস্তাবিত ফঙ্গধংয ব্যবস্থাটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে বাকিতে পণ্য পেতে এবং প্রথাগত স্বল্পমেয়াদী ব্যাংক ঋণের ওপর

নির্ভর না করে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে বিক্রেতা চড়া সুদের পরিবর্তে সাপ্লাই-চেইন ফাইন্যান্স প্রদানকারীকে প্রতি ত্রৈমাসিকে (৩ মাসে) সর্বোচ্চ ০.৫০% পর্যন্ত সার্ভিস ফি দেবে। তুলনামূলকভাবে, একটি বেসরকারি কোম্পানির বার্ষিক ব্যাংক সুদের হার প্রায় ১৫%, যা প্রতি ত্রৈমাসিকে ৩.৭৫%।

কম অর্থায়ন খরচ উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যয় কমাতে পারে এবং ফলস্বরূপ, পণ্যের দাম সহনীয় রাখতেও সাহায্য করবে। বর্ধিত ব্যবসায়িক কার্যক্রম সরকারের জন্য অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং প্রত্যক্ষ কর রাজস্ব আহরণে ভূমিকা রাখবে, পাশাপাশি কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতেও সহায়তা করবে।

মার্কেটিং এবং প্রচার

আমাদের মার্কেটিং কৌশলটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে লাভজনকভাবে গ্রাহকের চাহিদা মেটানোর ওপর গুরুত্ব দেবে। প্রস্তাবিত প্রযুক্তিটি বিদ্যমান সাপ্লাই-চেইন ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলোর জন্য একটি শক্তিশালী ইকোসিস্টেম হিসেবে কাজ করবে, যাদের ইতোমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রাহক ভিত্তি রয়েছে। এই কোম্পানিগুলো সোশ্যাল, ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে ফঙ্গধংয-এর প্রচার চালাতে পারে। ধারণাটি নতুন এবং অত্যন্ত ব্যবহারিক হওয়ায় এটি গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, যা অতিরিক্ত জনসচেতনতা তৈরিতে সহায়ক হবে।

প্রতিযোগী বিশ্লেষণ

প্রস্তাবিত মডেলটির সরাসরি প্রতিযোগী বাজারে খুব একটা নেই বললেই চলে, কারণ বিদ্যমান সাপ্লাই-চেইন ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলো তারল্য সংকট মোকাবেলায় সচরাচর এ ধরনের ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে না। তবে ব্যাংক, ফিনটেক কোম্পানি এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান অনুরূপ বা সদৃশ পণ্য নিয়ে এলে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ পরিবর্তন হতে পারে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

১. **ঝুঁকি:** মূল ক্রেতার ঋণযোগ্যতা (creditworthiness) এবং ঋণের ইতিহাস যাচাই করা কঠিন হতে পারে।

   প্রশমন: ব্যাংক বা ফিনটেক কোম্পানি নির্ধারিত নিয়মে 'নো ইউর কাস্টমার' (KYC) যাচাই সম্পন্ন করবে এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত সহযোগী নথি সংগ্রহ করবে।

২. **ঝুঁকি:** মূল ক্রেতা খেলাপী (default) হতে পারে।

   প্রশমন: ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান মূল ক্রেতার কাছ থেকে পর্যাপ্ত জামানত দাবি করতে পারে, যেমন–পণ্যের হাইপোথেকেশন, সিকিউরিটি চেক, ক্রেডিট ইন্স্যুরেন্স বা ঝুঁকির স্তর ও প্রকৃতি অনুযায়ী উপযুক্ত অন্য কোনো জামানত।

৩. **ঝুঁকি:** নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব ওয়েব-ভিত্তিক সফটওয়্যার তৈরির জন্য প্রচুর বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে।

   প্রশমন: বাজারে প্রথম প্রবেশকারী হিসেবে কোম্পানিটি 'ফার্স্ট মুভার অ্যাডভান্টেজ' বা অগ্রগামী সুবিধা পেতে পারে। সিস্টেমের নিরাপত্তা পরীক্ষা, নির্ভরযোগ্যতা এবং ব্যবহারের সহজতার জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়নের ব্যবস্থা রেখে ধাপে ধাপে এটি বাস্তবায়ন করা উচিত।

৪. **ঝুঁকি:** গ্রাহকরা এই নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে অপরিচিত থাকতে পারেন।

   প্রশমন: যদিও dCash একটি নতুন ধারণা, তবুও অধিকাংশ গ্রাহক ইতোমধ্যে স্মার্টফোন, ইন্টারনেট ব্যাংকিং এবং অন্যান্য ডিজিটাল সেবা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। স্পষ্ট নির্দেশিকা, সরাসরি প্রদর্শন (demonstrations) এবং কার্যকর গ্রাহক সহায়তা ব্যবহারকারীদের এই ব্যবস্থা গ্রহণে সহজে উৎসাহিত করতে পারে।

৫. **ঝুঁকি:** প্রস্তাবে অর্থায়নের সর্বোচ্চ সীমা স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা নেই।

   প্রশমন: ব্যাংক বা ফিনটেক কোম্পানি প্রচলিত ক্যাশ-ক্রেডিট সুবিধা দেওয়ার পরিবর্তে ডিজিটাল ইউনিট ইস্যু করবে। ইউনিটগুলোর মূল্য অন্তর্নিহিত প্রাপ্য বিল বা ইনভয়েস মূল্যের সর্বোচ্চ ৯০% পর্যন্ত নির্ধারিত হতে পারে।

৬. **ঝুঁকি:** হ্যাকিং, জালিয়াতি এবং সেবা বিঘ্নিত হওয়াসহ ব্যবস্থাটি কার্যক্রমগত ও সাইবার নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হতে পারে।

   প্রশমন: dCash একটি নিয়ন্ত্রিত অ্যাপ এবং রুদ্ধদ্বার লেনদেন রেকর্ডের (closed transaction record) মাধ্যমে পরিচালিত হবে, যা অনুমোদিত নেটওয়ার্কের বাইরে রূপান্তর বা স্থানান্তর সীমিত রাখবে। তা সত্ত্বেও ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের শক্তিশালী সাইবার নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ, ব্যবহারকারী যাচাইকরণ (user authentication), লেনদেন পর্যবেক্ষণ, ডেটা ব্যাকআপ এবং একটি পরীক্ষিত ইনসিডেন্ট-রেসপন্স প্ল্যান নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

প্রস্তাবিত ডিজিটাল ক্যাশ (dCash) ব্যবস্থা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের চলতি মূলধন (working capital) দক্ষভাবে পরিচালনায় সাহায্য করতে পারে, পাশাপাশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কম খরচে স্বল্পমেয়াদী অর্থায়নের সুযোগ করে দিতে পারে। কার্যকর প্রবিধান, সঠিক ক্রেডিট মূল্যায়ন এবং শক্তিশালী সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঠিক সমন্বয় ঘটলে এটি বাণিজ্যিক লেনদেনে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, রাজস্ব সংগ্রহ জোরদার এবং টেকসই অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ■

অধ্যাপক শাহজাহান খান ‘অর্ডার অব অস্ট্রেলিয়া’ পদকে ভূষিত

মূলত বাংলাদেশের সন্তান এই পণ্ডিত ২০ জন পিএইচডি শিক্ষার্থীর তত্ত্বাবধান, ২৬০টিরও বেশি জার্নাল নিবন্ধ প্রকাশ এবং ‘মেটা-অ্যানালাইসিস মেথডস’সহ বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনার কৃতিত্বের অধিকারী ।

ড. জহিরুল হক

সহযোগী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ, সংযুক্ত আরব আমিরাত বিশ্ববিদ্যালয়, ইউএই

সারসংক্ষেপ:

কুইন্সল্যান্ডের বৃহত্তম অভ্যন্তরীণ শহর টুউম্বাতে মুসলিম প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং বহুসাংস্কৃতিক সম্পর্ক উন্নয়নে অধ্যাপক শাহজাহান খান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ।

এমিরিটাস অধ্যাপক শাহজাহান খান একজন বিশিষ্ট বাংলাদেশি-অস্ট্রেলিয়ান শিক্ষাবিদ ও সমাজনেতা। ২০২৬ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ব্রিসবেনের গভর্নমেন্ট হাউসে কুইন্সল্যান্ডের গভর্নর ড. জিনেট ইয়ং এসি পিএসএম-এর কাছ থেকে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ‘মেডেল অব দ্য অর্ডার অব অস্ট্রেলিয়া’ (OAM) গ্রহণ করেন ।

অস্ট্রেলিয়া দিবস উপলক্ষ্যে ২৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে গভর্নর-জেনারেল স্যাম মোস্টিন এসি তাঁর এই পুরস্কারের

ঘোষণা দেন। কুইন্সল্যান্ড ও জাতীয় পর্যায়ে তাঁর কয়েক দশকের নেতৃত্ব এবং সেবামূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ 'অস্ট্রেলিয়ার মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি অনন্য অবদানের জন্য' তাঁকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়।

অধ্যাপক শাহজাহান খান পরিসংখ্যানে তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একাডেমিক ক্যারিয়ারের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ায় তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে সামাজিক, বহুসাংস্কৃতিক ও আন্তঃধর্মীয় সেবায় অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন।

একাডেমিক ক্যারিয়ার

কানাডার ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি থেকে গাণিতিক পরিসংখ্যানে পিএইচডি সম্পন্ন করার পর অধ্যাপক শাহজাহান খান ১৯৯২ সালে অস্ট্রেলিয়ায় অভিবাসিত হন। এর পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৯৩ সালের জানুয়ারিতে তিনি ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন কুইন্সল্যান্ডে (বর্তমানে ইউনিএসকিউ) যোগ দেন।

ইউনিএসকিউতে দীর্ঘ ক্যারিয়ারে তিনি পরিসংখ্যান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিভিন্ন একাডেমিক, গবেষণা ও নেতৃত্বমূলক পদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্ট্যাটিস্টিক্যাল কনসাল্টিং ইউনিট' প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। পাশাপাশি একাডেমিক কাউন্সিল, প্রোগ্রাম রিভিউ ও রিসার্চ কমিটি এবং বহুসাংস্কৃতিক বিষয়ক সংস্থায়ও তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ২০ জন পিএইচডি শিক্ষার্থীর সফল তত্ত্বাবধান করেছেন এবং ২৬০টিরও বেশি জার্নাল নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এছাড়া গবেষণা কর্মশালা পরিচালনা, প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য প্রদান এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ব্যাপকভাবে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। তাঁর রচিত বইগুলোর মধ্যে স্প্রিঙ্গার প্রকাশিত 'মেটা-অ্যানালাইসিস মেথডস' এবং পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি ও মডেলবিষয়ক গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি 'জার্নাল অব অ্যাপ্লাইড প্রবাবিলিটি অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স'-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান সম্পাদকও বটে।

পরিসংখ্যানে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এর মধ্যে ২০০১ সালে ইসলামিক ওয়ার্ল্ড এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন (ISESCO) গোল্ড মেডেল, ২০০৭ সালে ইসলামিক কান্ট্রিজ সোসাইটি অব স্ট্যাটিস্টিক্যাল সায়েন্সেস (ISOSS) গোল্ড মেডেল এবং ২০১২ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান সমিতি থেকে কাজী মোতাহার হোসেন স্বর্ণপদক অন্যতম। এ ছাড়া তিনি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিলায়াবিলিটি অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স থেকেও 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেছেন।

আইএসওএসএস (ISOSS)-এর সভাপতি হিসেবে তিনি মালয়েশিয়া, মিশর, কাতার, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান সম্মেলন আয়োজনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।

ইউনিএসকিউ (UniSQ) তাঁকে ২০২২ সালে 'প্রফেসর এমিরিটাস' উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁর সম্মানে ২০২৩ সালে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য চালু করা হয় 'প্রফেসর শাহজাহান খান স্কলারশিপ'।

এ ছাড়া ২০২২ থেকে ২০২৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত অধ্যাপক শাহজাহান খান এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেসের প্রবাসী ফেলোও নির্বাচিত হয়েছেন।

মুসলিম সম্প্রদায় গঠনে অবদান

একাডেমিক ক্যারিয়ারের পাশাপাশি অধ্যাপক খান কুইন্সল্যান্ডের টুউম্বা শহরে মুসলিম প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং বহুসাংস্কৃতিক সম্পর্ক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

'ইসলামিক সোসাইটি অব টুউম্বা'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং 'টুউম্বা ইসলামিক চ্যারিটেবল ট্রাস্ট'-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি একটি পুরোনো গির্জার ভবন অধিগ্রহণে সহায়তা করেন। পরবর্তীতে সেটিই টুউম্বার প্রথম মসজিদে রূপান্তরিত হয়।

তিনি 'টুউম্বা অ্যানুয়াল ইন্টারন্যাশনাল ফুড ফেস্টিভ্যাল' এবং 'মস্ক ওপেন ডে' গঠনেও সহায়তা করেন। এসব আয়োজনের মাধ্যমে খাবার, বন্ধুত্ব ও আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির বন্ধনে মুসলিম ও সাধারণ সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষ একত্রিত হওয়ার সুযোগ পায়।

২০১৫ সালে গার্ডেন সিটি মসজিদ দুটি অগ্নিকাণ্ডের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে অধ্যাপক শাহজাহান খান মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। একই সঙ্গে তিনি সমগ্র অস্ট্রেলিয়া থেকে তহবিল সংগ্রহে সহায়তা করেন এবং মসজিদটি পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টায় সফল নেতৃত্ব দেন।

সেই প্রচেষ্টার ফলেই বিশেষ কাঠামোর একটি আধুনিক মসজিদ নির্মিত হয়, যেখানে একসঙ্গে ৫০০ জনেরও বেশি মুসল্লি জামাতে নামাজ আদায় করতে পারেন। মসজিদটিতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সৌরবিদ্যুৎসহ পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই বিভিন্ন সুবিধা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অধ্যাপক শাহজাহান খান সংসদ সদস্য, মেয়র, কাউন্সিলর, বিশপ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃবৃন্দ এবং সরকারি কর্মকর্তাসহ নাগরিক ও ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করে আন্তঃধর্মীয় বোঝাপড়া ও সম্প্রীতি উৎসাহিত করেছেন। টুউম্বাতে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২১ সালে 'টুউম্বা ক্রনিকল' তাঁকে শহরের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে।

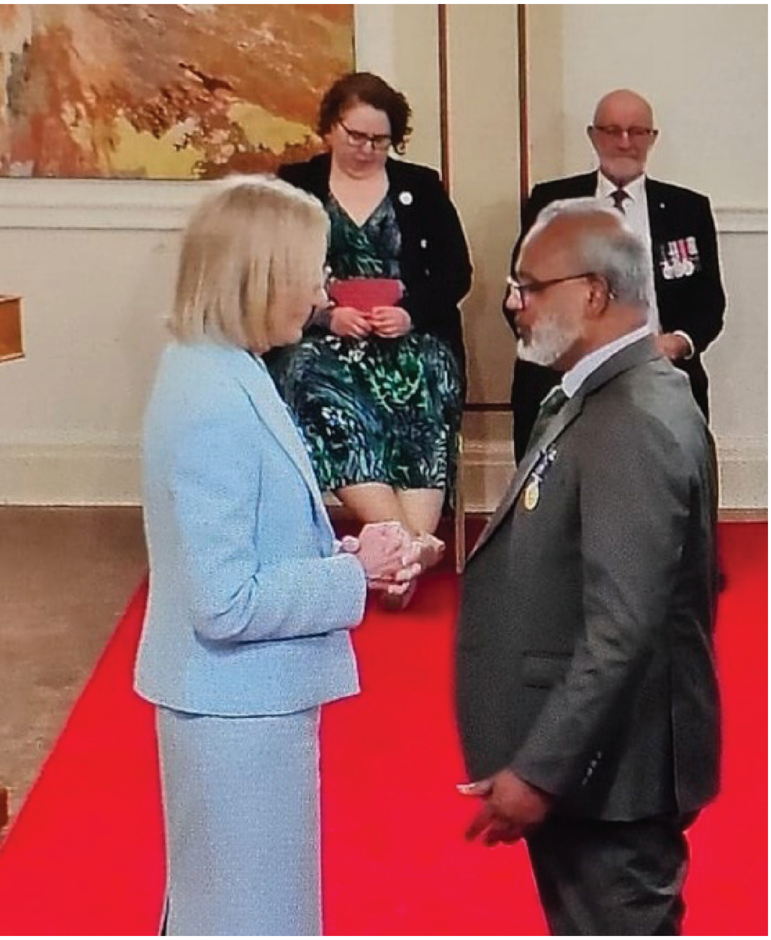

অধ্যাপক শাহজাহান খান উন্মুক্ত আলোচনা ও পেশাদার গবেষণা প্রকাশনায় তাঁর নিরলস অবদান অব্যাহত রেখেছেন। এর মধ্যে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা সংস্কৃতির বিকাশ নিয়ে তাঁর মৌলিক লেখালেখিও রয়েছে।

টুউম্বার সীমানা ছাড়িয়ে সেবা

অধ্যাপক শাহজাহান খানের সামাজিক নেতৃত্ব কেবল কুইন্সল্যান্ডের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তা পুরো অস্ট্রেলিয়ায় বিস্তৃত হয়েছে।

তিনি 'ইসলামিক কাউন্সিল অব কুইন্সল্যান্ড' এবং 'অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেশন অব ইসলামিক কাউন্সিলস'-এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি 'মুসলিম কমিউনিটি কোঅপারেটিভ অস্ট্রেলিয়া (MCCA)'-এর বোর্ড সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

ইউনিএসকিউতে তিনি ২০১৩ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত 'মাল্টিকালচারাল স্টাফ নেটওয়ার্ক'-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি বহুসাংস্কৃতিক ও বহুধর্মীয় সেমিনার, সম্মেলন এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ক্যাম্পাসে সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখেন।

তিনি ২০০১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত 'ইউনিএসকিউ ইসলামিক সেন্টার' প্রতিষ্ঠা ও সমন্বয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রার্থনাকেন্দ্রে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য নামাজ আদায় ও ইবাদতের উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাতেও তিনি বিশেষ অবদান রাখেন।

অধ্যাপক শাহজাহান খান সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি এবং বর্ণবাদ, চরমপন্থা ও সামাজিক বিভাজনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সচেতনতামূলক উদ্যোগে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছেন।

তাঁর মানবিক কাজের পরিধিতে শরণার্থী, নারী, তরুণ এবং সমাজের অন্যান্য অসচ্ছল ও পিছিয়ে থাকা সদস্যের সহায়তা করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া ও বিদেশে সাইক্লোন, দাবানল এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর ত্রাণ তহবিল সংগ্রহেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

দীর্ঘদিনের এই বহুমুখী সামাজিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বেশ কয়েকটি মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার লাভ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে–কুইন্সল্যান্ড সরকার প্রদত্ত 'কালচারাল ডাইভারসিটি অ্যাম্বাসেডর অ্যাওয়ার্ড', 'কুইন্সল্যান্ড পুলিশ সার্ভিস কমিউনিটি সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড', 'কুইন্সল্যান্ড মাল্টিকালচারাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড' এবং 'ইসলামিক কাউন্সিল অব কুইন্সল্যান্ড কমিউনিটি সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড'।

তিনি গবেষণা প্রকাশনা, সমাজসেবা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তিতে অসামান্য অবদানের জন্য ইউনিএসকিউ থেকেও একাধিক স্বীকৃতি ও পদক অর্জন করেছেন।

অধ্যাপক শাহজাহান খান উন্মুক্ত আলোচনা ও পেশাদার গবেষণা প্রকাশনায় তাঁর নিরলস অবদান অব্যাহত রেখেছেন। এর মধ্যে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা সংস্কৃতির বিকাশ নিয়ে তাঁর মৌলিক লেখালেখিও রয়েছে।

তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবন মূলত দুটি সমান্তরাল সেবাক্ষেত্রের অনন্য সমন্বয়–পরিসংখ্যানশাস্ত্রে একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একাডেমিক ক্যারিয়ার এবং অস্ট্রেলিয়ার মুসলিম ও বহুসাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কয়েক দশকের নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবী নেতৃত্ব। ■

বিশ্ব মানচিত্রে আফ্রিকার অবস্থান সংশোধন: জাতিসংঘের প্রস্তাব পাস, বিরোধিতা যুক্তরাষ্ট্রের

আল-উম্মাহ ডেস্ক

বিশ্বকে আমরা যেভাবে দেখি, তার ওপর মানচিত্রের গভীর প্রভাব রয়েছে। একটি মানচিত্র কেবল ভৌগোলিক অবস্থানই নির্দেশ করে না; বরং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে মানুষের ধারণা, গুরুত্ববোধ ও মানসিক মানচিত্রও তৈরি করে। সেই প্রেক্ষাপটেই বিশ্ব মানচিত্রে আফ্রিকার আকার ও অবস্থান নিয়ে দীর্ঘদিনের বিতর্ক নতুন করে সামনে এসেছে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আফ্রিকার নেতৃত্বে উত্থাপিত একটি উদ্যোগ বহুল ব্যবহৃত বিশ্ব মানচিত্রের বিকৃতি সংশোধনের আহ্বান জানিয়েছে। প্রস্তাবটির পক্ষে ১৬৪টি দেশ ভোট দিলেও এর বিপক্ষে ভোট দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এবং ভোটদানে বিরত ছিল আরও ছয়টি দেশ।

আফ্রিকান ইউনিয়নের দেশগুলোর উদ্যোগে এবং টোগোর নেতৃত্বে উত্থাপিত

‘কারেক্ট দ্য ম্যাপ’ বা ‘মানচিত্র সংশোধন করুন’ প্রচেষ্টার লক্ষ্য হলো বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত এমন একটি মানচিত্র-ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা, যা আফ্রিকার মতো বিষুবরেখার কাছাকাছি অঞ্চলগুলোকে তাদের প্রকৃত আয়তনের তুলনায় অনেক ছোট করে উপস্থাপন করে।

উদ্যোক্তাদের মতে, বিষয়টি নিছক মানচিত্রের কারিগরি ত্রুটি নয়; বরং দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বকে কীভাবে দেখা ও বোঝা হয়, তার সঙ্গেও এর গভীর সংযোগ রয়েছে।

কেন আফ্রিকাকে ছোট দেখায় মানচিত্র?

বিশ্বের সবচেয়ে পরিচিত মানচিত্র-ব্যবস্থাগুলোর একটি হলো ‘মারকেটর প্রজেকশন’। ফ্লেমিশ মানচিত্রকার জেরার্ডাস মারকেটর ১৫৬৯ সালে সামুদ্রিক নৌচলাচলের প্রয়োজন বিবেচনায় এই প্রজেকশন তৈরি করেছিলেন।

মারকেটর প্রজেকশনের বড় সুবিধা হলো—এতে মানচিত্রের সরলরেখাগুলো নির্দিষ্ট কম্পাস-দিকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে। ফলে নাবিকদের সমুদ্রপথ নির্ধারণে এটি অত্যন্ত কার্যকর ছিল।

তবে এর বিনিময়ে ভূখণ্ডের আকারে বড় ধরনের বিকৃতি তৈরি হয়। বিশেষ করে মেরুর দিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অঞ্চলগুলো তাদের প্রকৃত আয়তনের তুলনায় অনেক বড় দেখায়। এর ফলে বিষুবরেখা সংলগ্ন আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মতো মহাদেশগুলোকে তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট দেখায়।

এই পার্থক্য বোঝার জন্য আফ্রিকা ও গ্রিনল্যান্ডের তুলনা প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। প্রচলিত মারকেটর মানচিত্রে এই দুটি ভূখণ্ডকে প্রায় কাছাকাছি আকারের মনে হতে পারে, অথচ বাস্তবে আফ্রিকার আয়তন গ্রিনল্যান্ডের তুলনায় প্রায় ১৪ গুণ।

অর্থাৎ, মানচিত্রে যে চিত্রটি চোখে ধরা পড়ে, বাস্তব ভূখণ্ডের অনুপাত তার সঙ্গে মেলে না।

‘প্রতীকী সংকোচন’ নিয়ে আফ্রিকার অভিযোগ

আফ্রিকান দেশগুলোর যুক্তি হলো, এই বিকৃতিকে শুধু জ্যামিতিক বা কারিগরি সমস্যা হিসেবে দেখলে এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব উপেক্ষিত থেকে যায়।

তাদের মতে, দীর্ঘ সময় ধরে শিক্ষা, সংবাদমাধ্যম, আন্তর্জাতিক প্রকাশনা ও বিভিন্ন নীতিনির্ধারণী উপকরণে ব্যবহৃত মানচিত্র মানুষের সম্মিলিত কল্পনায় পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট চিত্র তৈরি করেছে। সেখানে আফ্রিকা তার প্রকৃত ভৌগোলিক ব্যাপ্তির তুলনায় ছোট হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে।

টোগোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবার্ট ডাসি বলেন, “মানচিত্র বিশ্বের প্রতি আমাদের বোধগম্যতাকে রূপ দেয়।”

তাঁর ভাষায়, মানচিত্র শিক্ষা পরিচালনা করে, কল্পনাকে প্রভাবিত করে এবং মানুষের সম্মিলিত উপলব্ধিকে গড়ে তোলে।

তিনি আরও বলেন, বিশ্বের একটি বিকৃত চিত্র পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এমন কিছু ধারণা পৌঁছে দিতে পারে, যা বাস্তব ভৌগোলিক অনুপাতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই উদ্যোগ কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা সভ্যতার বিরুদ্ধে পরিচালিত নয়। এর লক্ষ্য হলো বৈজ্ঞানিক নির্ভুলতা এবং সব জনগোষ্ঠীর সমান মর্যাদার ভিত্তিতে জ্ঞানকে উপস্থাপন করা।

আফ্রিকার উদ্যোগে ফ্রান্সের অবস্থান

আফ্রিকার এই উদ্যোগে ইউরোপের কয়েকটি দেশের অবস্থানও নতুন করে আলোচনায় এসেছে। এর অংশ হিসেবে ফ্রান্স বিশ্বের মানচিত্রে মারকেটর প্রজেকশনের ব্যবহার থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।

ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাঁ-নোয়েল বারোটের বক্তব্য অনুযায়ী, বিশ্বকে সঠিকভাবে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা শুরু হয় সেটিকে কীভাবে চিত্রিত করা হচ্ছে, সেখান থেকেই। তাঁর মতে, মানচিত্রের বিকৃতি মানুষের উপলব্ধির গভীরে প্রভাব ফেলতে পারে এবং সেই কারণে প্রচলিত উপস্থাপনা পুনর্বিবেচনার সময় এসেছে।

ফ্রান্স ‘এককার্ট ওঠ প্রজেকশন’ ব্যবহারের দিকে এগোচ্ছে। এটি একটি সমান-ক্ষেত্রফলভিত্তিক প্রজেকশন, যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আয়তন তুলনামূলকভাবে বাস্তব অনুপাতের কাছাকাছি রাখা হয়।

এর ফলে আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার মতো বিষুবরেখার কাছাকাছি অঞ্চলগুলোকে প্রচলিত মারকেটর মানচিত্রের তুলনায় বড় দেখায়। বিপরীতে ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মতো উচ্চ অক্ষাংশের অঞ্চলগুলোর দৃশ্যমান আকার কিছুটা কমে আসে।

এটি জাতিসংঘে উত্থাপিত উদ্যোগে আলোচিত সমান-ক্ষেত্রফলভিত্তিক প্রজেকশনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও ফ্রান্স ঠিক একই প্রজেকশন গ্রহণ করছে না।

যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তি

আফ্রিকার উদ্যোগটি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পায়নি। ভোটাভুটির আগে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি ইয়ারিনা ফেরেনসেভিচ প্রস্তাবটির তীব্র সমালোচনা করেন।

তিনি প্রশ্ন তোলেন, বাস্তব বৈশ্বিক সমস্যাগুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে জাতিসংঘ কেন ষোড়শ শতাব্দীর মানচিত্র-প্রজেকশন এবং এর সঙ্গে ক্ষতিপূরণ ও জ্ঞানগত ন্যায়বিচারের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করছে।

ফলে মানচিত্রের কারিগরি প্রশ্নটি জাতিসংঘে বৃহত্তর এক রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কের অংশ হয়ে ওঠে—বিশ্বকে কীভাবে উপস্থাপন করা হবে এবং সেই উপস্থাপনা মানুষের চিন্তা ও উপলব্ধিকে কতটা প্রভাবিত করে, সেই প্রশ্নে।

‘কারেক্ট দ্য ম্যাপ’ উদ্যোগ

মানচিত্র সংশোধনের এই প্রচেষ্টার সূচনা হয় টোগোকে কেন্দ্র করে। ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে আফ্রিকান ইউনিয়ন

টোগোকে এই উদ্যোগের পক্ষে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব দেয়। আফ্রিকার ৫৫টি দেশই এতে সমর্থন জানিয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

এর আগে ২০২৪ সালে 'কারেক্ট দ্য ম্যাপ' নামে একটি প্রচারণা শুরু হয়। এর মূল বক্তব্য ছিল—মানচিত্রকে কেবল একটি নিরপেক্ষ কারিগরি উপকরণ হিসেবে দেখলে এর সামাজিক প্রভাবের গুরুত্বপূর্ণ দিকটি বাদ পড়ে যায়।

মানুষ কীভাবে নিজের দেশ, মহাদেশ এবং বিশ্বে নিজের অবস্থানকে দেখে, মানচিত্র সেই ধারণাকেও প্রভাবিত করতে পারে।

এই প্রচারণা আফ্রিকার ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার এবং বিশ্বব্যাপী আফ্রিকার উপস্থাপনার অসমতা নিয়ে বৃহত্তর আলোচনার সঙ্গেও যুক্ত হয়েছে।

যদিও প্রস্তাবের চূড়ান্ত ভাষায় ঐতিহাসিক ক্ষোভ ও ঔপনিবেশিকতার সরাসরি উল্লেখ কিছুটা সংযত করা হয়েছে, তবু এতে বহুল ব্যবহৃত মানচিত্রের বিকৃতি কীভাবে আফ্রিকার প্রতীকী অবস্থানকে প্রভাবিত করেছে—সে বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

মানচিত্র কি সত্যিই নিরপেক্ষ?

মানচিত্রের এই বিতর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—পৃথিবীর গোলাকার পৃষ্ঠকে সমতল কাগজ বা পর্দায় তুলে ধরতে গেলে কোনো না কোনো ধরনের বিকৃতি অনিবার্য।

ফলে প্রশ্নটি শুধু 'কোন মানচিত্র সঠিক'—এমন নয়; বরং কোন উদ্দেশ্যে কোন ধরনের প্রজেকশন ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

নৌ-নির্দেশনার ক্ষেত্রে মারকেটর প্রজেকশনের বিশেষ সুবিধা রয়েছে। কিন্তু মহাদেশগুলোর প্রকৃত আয়তন তুলনা করার ক্ষেত্রে সমান-ক্ষেত্রফলভিত্তিক প্রজেকশন অধিক উপযোগী।

অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট মানচিত্র সব উদ্দেশ্যে সমানভাবে কার্যকর নয়। এই বাস্তবতাই মানচিত্রের ব্যবহার নিয়ে নতুন করে ভাবার প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছে।

শিক্ষা ও গণমাধ্যমে সম্ভাব্য প্রভাব

জাতিসংঘের এই উদ্যোগের ফলস্বরূপ জাতিসংঘভুক্ত বিভিন্ন সংস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে আরও সঠিক ক্ষেত্রফলভিত্তিক মানচিত্র ব্যবহারে উৎসাহিত হতে পারে।

এর প্রভাব পড়তে পারে পাঠ্যবই, আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন, সংবাদমাধ্যমের গ্রাফিকস এবং বিভিন্ন ডিজিটাল শিক্ষাসামগ্রীতে ব্যবহৃত মানচিত্রে।

তবে এর অর্থ এই নয় যে মারকেটর প্রজেকশন অচিরেই পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। নৌ-নির্দেশনা ও নির্দিষ্ট কিছু ভৌগোলিক কাজে এর ব্যবহারিক সুবিধা এখনও রয়েছে। তাছাড়া পৃথিবীর গোলাকার পৃষ্ঠকে সমতলে রূপান্তরের ক্ষেত্রে

মানচিত্র আমাদের কেবল বলে না যে কোথায় কোন দেশ বা মহাদেশ অবস্থিত। এটি আমাদের চোখের সামনে একটি নির্দিষ্ট বিশ্বচিত্রও নির্মাণ করে। কোন অঞ্চলকে বড় দেখানো হচ্ছে, কোন অঞ্চলকে ছোট দেখানো হচ্ছে এবং কোন ভূখণ্ডকে কেন্দ্রীয় বা প্রান্তিক হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে—এসব বিষয় মানুষের দীর্ঘমেয়াদি উপলব্ধির ওপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।

কোনো প্রজেকশনই সব ধরনের বিকৃতি সম্পূর্ণভাবে দূর করতে পারে না।

একটি মানচিত্রের চেয়েও বড় প্রশ্ন

বিশ্ব মানচিত্রে আফ্রিকার আকার সংশোধনের উদ্যোগকে কেবল একটি কারিগরি পরিবর্তন হিসেবে দেখলে এর বৃহত্তর তাৎপর্য হয়তো ধরা পড়বে না।

মানচিত্র আমাদের কেবল বলে না যে কোথায় কোন দেশ বা মহাদেশ অবস্থিত। এটি আমাদের চোখের সামনে একটি নির্দিষ্ট বিশ্বচিত্রও নির্মাণ করে। কোন অঞ্চলকে বড় দেখানো হচ্ছে, কোন অঞ্চলকে ছোট দেখানো হচ্ছে এবং কোন ভূখণ্ডকে কেন্দ্রীয় বা প্রান্তিক হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে—এসব বিষয় মানুষের দীর্ঘমেয়াদি উপলব্ধির ওপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।

আফ্রিকার দেশগুলোর কাছে তাই মানচিত্র সংশোধনের উদ্যোগটি বৃহত্তর এক প্রচেষ্টার অংশ—যার লক্ষ্য বিশ্বের ভৌগোলিক বাস্তবতাকে আরও যথাযথভাবে উপস্থাপন করা এবং দীর্ঘদিনের প্রচলিত চিত্রের কারণে তৈরি হওয়া ভারসাম্যহীন ধারণাগুলো পুনর্বিবেচনা করা।

শেষ পর্যন্ত মানচিত্র বদলালেই বিশ্বের ক্ষমতার কাঠামো বদলে যাবে না। কিন্তু 'বিশ্বকে আমরা কীভাবে দেখি—সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ তৈরি হতে পারে।' আর সেই প্রশ্নই হয়তো এই উদ্যোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। ■

ডিজিটাল বিভ্রান্তির তাত্ত্বিক ভিত্তি

নাবিল সাবা
মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশনে স্নাতক ও ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টে স্নাতকোত্তর, সিরিয়া

কীভাবে বিভ্রান্তিকর মিডিয়া শত্রু (Enemy), নায়ক (Hero) ও নাগরিকের পরিচয় নতুনভাবে তৈরি করে? কীভাবে তাদের একটি নির্দিষ্ট ও একমুখী ভাবমূর্তির মধ্যে আটকে ফেলা হয় এবং পরে সেই ভাবমূর্তিকে নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণে ব্যবহার করা হয়?

এই নিবন্ধে এই প্রক্রিয়াটি বোঝার জন্য ছয়টি ধাপের একটি মডেল তুলে ধরা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে, কীভাবে বিভ্রান্তিকর সংবাদমাধ্যম মানুষের মনে শত্রু, নায়ক ও নাগরিকের একটি নির্দিষ্ট ছবি তৈরি করে। পাশাপাশি, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই পদ্ধতি কীভাবে কাজ করে, তাও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এখানে মূল বক্তব্য হলো–‘স্টিরিওটাইপ’ বা বাঁধাধরা ধারণা শুধু মানুষের মনের কোনো সাধারণ ভুল ধারণা নয়; এটি অনেক সময় পরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হয় এবং মানুষের চিন্তা ও আচরণকে প্রভাবিত করার কাজে ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তি,

সমাজ ও ক্ষমতার সম্পর্কও নতুনভাবে গড়ে উঠতে পারে।

প্রথম অংশ: মিডিয়া কীভাবে বাঁধাধরা ধারণা তৈরি করে?

এই আলোচনায় কেবল ভুল তথ্য কীভাবে তৈরি ও ছড়ানো হয়, তা দেখা হচ্ছে না; বরং আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে–বিভ্রান্তিকর মিডিয়া কীভাবে মানুষের মনে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা ঘটনা সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ধারণা তৈরি করে।

"যখন ছবি নিজেই বাস্তবের চেয়েও বেশি বাস্তব হয়ে ওঠে এবং গ্রহীতা মূল ও নকলের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হয়..."

ছবি মানুষের মনে খুব দ্রুত প্রভাব ফেলে। এটি কেবল কোনো বিষয় দেখানোর মাধ্যম নয়; মানুষের চিন্তা ও স্মৃতিতেও এর গভীর প্রভাব রয়েছে। প্রজ্ঞামূলক স্নায়ুবিজ্ঞানের (Cognitive Neuroscience) গবেষণা অনুযায়ী, লিখিত লেখার তুলনায় মানুষের মস্তিষ্ক ছবি বা ভিজ্যুয়াল অনেক দ্রুত বিশ্লেষণ করতে পারে। এ কারণেই মানুষের মনে কোনো ধারণা তৈরি করা এবং তা দীর্ঘদিন ধরে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে ছবি অত্যন্ত কার্যকর।

এর প্রাথমিক উদাহরণ পাওয়া যায় গুহাচিত্রে। হাজার হাজার বছর আগে মানুষ ছবি এঁকে নিজেদের অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস ও স্মৃতি প্রকাশ করত। আজকের দিনে রিলস, মিমস, ছবি ও ছোট ভিডিও একই কাজ করছে, তবে আরও আধুনিক ও দ্রুতগতির মাধ্যমে।

অর্থাৎ, মাধ্যম বদলেছে; কিন্তু উদ্দেশ্যের অনেকটাই এক রয়ে গেছে–মানুষকে কোনো বিষয় সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ধারণা দেওয়া, সেই ধারণাকে মনে গেঁথে দেওয়া এবং তার মাধ্যমে মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করা।

ফরাসি চিন্তাবিদ জাঁ বোদ্রিয়ার (Jean Baudrillard) তাঁর 'Simulacra' বা অনুসারী বাস্তবতা ধারণায় দেখিয়েছেন, কখনো কখনো মানুষের কাছে কোনো ছবিই বাস্তবতার চেয়ে বেশি সত্য বলে মনে হতে পারে। তখন মানুষ আসল ঘটনা ও তার তৈরি করা ছবির মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।

মনোবিজ্ঞানী কার্ল জং (Carl Jung)-এর চিন্তার সঙ্গেও এর কিছু মিল রয়েছে। জং মনে করতেন, প্রতীক ও ছবি মানুষের অবচেতন মনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। ফলে কোনো ছবি বা প্রতীক অনেক সময় যুক্তি দিয়ে যাচাই করার আগেই মানুষের মনে একটি নির্দিষ্ট ধারণা তৈরি করে দিতে পারে।

তাত্ত্বিক কাঠামো: মানসিক ছবি থেকে স্টিরিওটাইপ

মানসিক ছবি (Mental Image)

মানসিক ছবি বলতে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, ঘটনা বা ধারণা সম্পর্কে আমাদের মনের ভেতরে তৈরি হওয়া একটি ধারণাকে বোঝায়।

যেমন–কোনো দেশ, জাতি বা নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠী সম্পর্কে আমরা যা জানি বা যা শুনেছি, সেসব মিলিয়ে আমাদের মনে তাদের একটি ছবি তৈরি হয়। এই ছবি আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সামাজিক পরিবেশ এবং মিডিয়ায় দেখা বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

এই মানসিক ছবি স্থির নয়। নতুন তথ্য বা অভিজ্ঞতা পেলে এটি পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু বিভ্রান্তিকর মিডিয়া এই পরিবর্তনশীল মানসিক ছবিকেই একটি নির্দিষ্ট দিকে চালিত করতে পারে। একই ধরনের তথ্য বারবার দেখিয়ে কোনো একটি ধারণাকে মানুষের মনে স্থায়ী করে তোলা সম্ভব।

বাঁধাধরা ধারণা বা স্টিরিওটাইপ (Stereotype)

স্টিরিওটাইপ হলো কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সম্পর্কে অতিরিক্ত সরল ও একমুখী ধারণা। একটি পুরো গোষ্ঠীর মানুষকে কয়েকটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আটকে দেওয়াই এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন–একজন ব্যক্তির আচরণের ভিত্তিতে পুরো একটি গোষ্ঠী সম্পর্কে একই ধরনের নেতিবাচক ধারণা তৈরি করা।

স্টিরিওটাইপ শুধু তথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না। এর সঙ্গে ভয়, ঘৃণা, রাগ, অবজ্ঞা কিংবা অতিরিক্ত প্রশংসার মতো আবেগও যুক্ত হতে পারে। এ ধরনের ধারণার ফলে একটি জটিল বিষয়কে অতি সরল করে দেখানো হয়। একই সঙ্গে কোনো গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য বা তাদের ওপর আধিপত্যকেও যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়।

মানসিক ছবি ও স্টিরিওটাইপের পার্থক্য

প্রতিটি স্টিরিওটাইপই একটি মানসিক ছবি, কিন্তু প্রতিটি মানসিক ছবি স্টিরিওটাইপ নয়। মানসিক ছবি পরিবর্তনশীল ও তুলনামূলকভাবে জটিল হতে পারে। কিন্তু স্টিরিওটাইপ হলো এমন একটি মানসিক ছবি, যা ধীরে ধীরে একমুখী ও অনমনীয় হয়ে ওঠে। তখন নতুন তথ্য বা বিপরীত প্রমাণও সেই ধারণাকে সহজে পরিবর্তন করতে পারে না।

মস্তিষ্কের সহজ পথই যখন বিভ্রান্তির হাতিয়ার

প্রতিদিন আমরা বিপুল পরিমাণ তথ্য পেয়ে থাকি। মানুষের মস্তিষ্কের পক্ষে প্রতিটি তথ্য আলাদাভাবে যাচাই করা সম্ভব নয়। তাই দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মস্তিষ্ক কিছু 'ঐবঁৎরংঃরপং' বা জ্ঞানীয় সংক্ষিপ্ত পথ ব্যবহার করে। সমস্যা তৈরি হয় তখন, যখন কেউ এই মানসিক প্রক্রিয়াকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে।

বিভ্রান্তিকর মিডিয়া কেবল ভুল তথ্য ছড়ায় না; এটি এমন একটি কাঠামো তৈরি করে, যার মাধ্যমে মানুষ পৃথিবী, অন্য মানুষ এবং নিজের অবস্থানকে একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে শুরু করে। ফলে একজন প্রতিবেশীকে শত্রু, একজন নাগরিককে দেশদ্রোহী কিংবা একটি ন্যায্য দাবিকেও ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখানো সম্ভব হয়।

ডিজিটাল মিডিয়ার কারণে এই প্রক্রিয়া আরও দ্রুততর হয়েছে। বারবার একই ধরনের ছবি, ভিডিও, শিরোনাম ও বক্তব্য দেখানোর মাধ্যমে একটি পরিবর্তনশীল ধারণাকে দ্রুত একটি শক্ত ও স্থায়ী স্টিরিওটাইপে পরিণত করা যায়।

ছবির স্নায়বিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি

প্রতীক, মানসিক ছবি, স্টিরিওটাইপ ও মিডিয়ায় ব্যবহৃত ছবির মধ্যে তাত্ত্বিক পার্থক্য থাকলেও এগুলোর একটি অভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি রয়েছে।

বিভ্রান্তিকর মিডিয়া মানুষের এই মানসিক বৈশিষ্ট্যকে কাজে

লাগিয়ে নমনীয় মানসিক ছবিকে অনমনীয় স্টিরিওটাইপে পরিণত করে। বিশেষ করে, মানুষের সমালোচনামূলক চিন্তার দুর্বলতা এবং একই তথ্য বারবার দেখলে সেটিকে সত্য বলে মনে করার মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা এখানে সুকৌশলে কাজে লাগানো হয়।

কীভাবে মানসিক ছবি স্টিরিওটাইপে পরিণত হয়: ছয় ধাপের মডেল

সামাজিক মনোবিজ্ঞান ও ক্রিটিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের ভিত্তিতে এই প্রক্রিয়াটিকে ছয়টি ধাপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

- **ধাপ শূন্য: স্বাভাবিক মানসিক ছবি**

  কোনো গোষ্ঠী সম্পর্কে মানুষের প্রাথমিক ধারণা সাধারণত অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ বা জটিল থাকে। এই অবস্থাটিই বিভ্রান্তিকর মিডিয়ার জন্য 'কাঁচামাল' হিসেবে কাজ করে।

- **ধাপ এক: নামকরণ (Labeling)**

  প্রথমে কোনো গোষ্ঠীকে একটি সহজ ও মনে রাখার মতো নাম দেওয়া হয়। যেমন–'বিশ্বাসঘাতক', 'এজেন্ট' বা 'চরমপন্থী'। এর ফলে একটি জটিল সমাজগোষ্ঠীকে একটি মাত্র পরিচয়ের মধ্যে আটকে ফেলা সহজ হয়।

- **ধাপ দুই: বৈশিষ্ট্য আরোপ (Attribution)**

  এরপর সেই গোষ্ঠীর ওপর একটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য বারবার আরোপ করা হয়। যেমন–'তারা আমাদের দেশকে ঘৃণা করে' বা 'তারা আমাদের সম্পদ চুরি করছে'। এভাবে কেবল একটি নাম দেওয়ার বদলে সেই নামের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট নেতিবাচক ধারণাও স্থায়ীভাবে যুক্ত হয়ে যায়।

- **ধাপ তিন: পুনরাবৃত্তি (Repetition)**

  এরপর মিডিয়া, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্ট, সংবাদ ও বিশ্লেষণে একই নাম ও ধারণা বারবার প্রচার করা হয়। একই কথা বারবার শুনতে শুনতে মানুষের কাছে তা পরিচিত হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে প্রমাণ ছাড়াই সেটিকে ধ্রুব সত্য বলে মনে হতে পারে।

- **ধাপ চার: অতিরিক্ত সাধারণীকরণ (Overgeneralization)**

  এরপর কোনো গোষ্ঠীর একজন ব্যক্তির নেতিবাচক কাজকে পুরো গোষ্ঠীর চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়। অন্যদিকে, ওই গোষ্ঠীর ইতিবাচক কাজগুলো সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয় বা ব্যতিক্রম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। ফলে গোষ্ঠীর ভেতরের বৈচিত্র্য হারিয়ে যায় এবং সবাইকে একই রকম বলে মনে হতে থাকে।

- **ধাপ পাঁচ: আবেগের সঙ্গে যুক্ত করা (Emotional Anchoring)**

  এবার ওই ধারণার সঙ্গে ভয়, রাগ বা ঘৃণার মতো শক্তিশালী আবেগ যুক্ত করা হয়। উত্তেজক ছবি, ভিডিও, সংগীত কিংবা রাজনৈতিক বক্তব্যের মাধ্যমে এটি করা হয়ে থাকে। এর ফলে মানুষ অনেক সময় যুক্তি দিয়ে বিষয়টি যাচাই করার আগেই আবেগের বশে প্রতিক্রিয়া দেখায়।

- **ধাপ ছয়: ধারণাটিকে স্থায়ী করা (Fixation)**

  শেষ পর্যায়ে ধারণাটি এতটাই শক্ত হয়ে যায় যে, বিপরীত জোরালো প্রমাণ থাকলেও মানুষ তা সহজে পরিবর্তন করতে চায় না। তখন ওই গোষ্ঠীকে মানুষের মনে এমন এক 'শত্রু' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার সঙ্গে আলোচনা বা সমঝোতা করাও অসম্ভব বলে মনে হতে পারে।

এই মডেল কীভাবে কাজে লাগে?

১. শত্রু তৈরি (Enemy Making)

বিভ্রান্তিকর মিডিয়া কোনো রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা জাতিগত গোষ্ঠীকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে পারে, যেন তারা সমাজ বা দেশের অস্তিত্বের জন্য চরম হুমকি। এটি কেবল একটি বক্তব্যের মাধ্যমে হয় না; বরং ধাপে ধাপে একটি নির্দিষ্ট ধারণা মানুষের মনে সুপ্তভাবে গেঁথে দেওয়া হয়। এর ফলে মানুষের ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকৃত সমস্যা থেকে সরিয়ে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। এটিকে এক ধরনের 'সামাজিক প্রকৌশল' (Social Engineering) বলা চলে। এটি সাধারণত তিনভাবে দেখা যায়:

- রাজনৈতিক বক্তব্য: রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে বিশ্বাসঘাতক বা বিদেশি এজেন্ট হিসেবে দেখানো হয়। এতে তাদের সঙ্গে আলোচনা না করার এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জনসমর্থন তৈরি হয়।
- সাম্প্রদায়িক বক্তব্য: অন্য ধর্ম বা মতের মানুষকে সাধারণ নাগরিক হিসেবে না দেখে পথভ্রষ্ট বা শত্রু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এতে সামাজিক বিরোধ ও দূরত্ব আরও তীব্র হয়।
- জাতীয়তাবাদী বক্তব্য: দেশের কোনো সংখ্যালঘু বা বিশেষ জনগোষ্ঠীকে জাতীয় পরিচয়ের জন্য হুমকি হিসেবে তুলে ধরা হয়। এর ফলে বর্জন, বৈষম্য বা সংঘাতের পরিবেশ তৈরি হতে পারে।

২. নায়ক তৈরি (Hero Making)

বিভ্রান্তিকর মিডিয়া শুধু শত্রু তৈরি করে না; একই প্রক্রিয়ায় নায়কও তৈরি করতে পারে। এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বা প্রতীককে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেন তার কোনো ভুল বা দুর্বলতা নেই। তার মানবিক দিক ও সীমাবদ্ধতাগুলো সম্পূর্ণ আড়াল করে তাকে একটি নিখুঁত প্রতীকে পরিণত করা হয়।

সংকটের সময় মানুষ যখন নিরাপত্তা বা নেতৃত্বের জন্য উদ্বিগ্ন থাকে, তখন একজন 'রক্ষাকর্তা'কে ঘিরে এমন আবেগঘন ধারণা তৈরি করা বেশ সহজ হয়। এরিক ফ্রম (Erich Fromm) তাঁর 'Escape from Freedom' বইয়ে দেখিয়েছেন, সামাজিক ভয় এমন এক পরিবেশ তৈরি করতে পারে, যেখানে মানুষ প্রশ্নহীন নেতৃত্বের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তখন সেই নেতার সামান্য সমালোচনাকেও দেশদ্রোহিতা হিসেবে দেখা হতে পারে।

নায়ক তৈরির কয়েকটি ক্ষেত্র হলো:

- **রাজনৈতিক বক্তব্য:** কোনো নেতাকে জাতি বা দেশের একমাত্র রক্ষক হিসেবে তুলে ধরা হয়। তাঁর সাফল্যকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয় এবং ভুলগুলোকে মহৎ 'ত্যাগ' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়।
- **ক্রীড়া মিডিয়া:** খেলোয়াড়কে শুধু ক্রীড়াবিদ হিসেবে না দেখে জাতীয় পরিচয়ের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। নোয়াম চমস্কি (Noam Chomsky) খেলাধুলার এই দিকটিকে অন্ধ দেশপ্রেম তৈরির একটি মাধ্যম হিসেবে সমালোচনা করেছেন। বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন (Benedict Anderson)-এর 'কল্পিত সম্প্রদায়' ধারণার আলোকে খেলাধুলা দূরদূরান্তে থাকা মানুষদের মধ্যেও এক ধরনের কৃত্রিম ঐক্যবোধ তৈরি করতে পারে। পিয়ের বোর্দিও (Pierre Bourdieu)-র 'প্রতীকী মূলধন' ধারণার আলোকে এটি সামাজিক মর্যাদা ও শ্রেণিবিন্যাসকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে।
- **পপ কালচার:** নাটক, সিনেমা বা মিমের কোনো কাল্পনিক চরিত্রকে পরম নৈতিক আদর্শ হিসেবে মানুষের মনে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

মূল প্যারাডক্স: শত্রু ও নায়ক তৈরির পদ্ধতি মূলত একই। পার্থক্য কেবল অভিমুখের বা দিকের। শত্রুর ক্ষেত্রে ঘৃণা তৈরি করা হয়, আর নায়কের ক্ষেত্রে তৈরি করা হয় অন্ধ আনুগত্য। কিন্তু দুটিই মানুষের চিন্তা ও আচরণকে নিয়ন্ত্রণের শক্তিশালী হাতিয়ার।

৩. 'সুনাগরিক' কারা—তার সংজ্ঞা বদলে দেওয়া

বিভ্রান্তিকর মিডিয়া কেবল শত্রু ও নায়ক তৈরি করেই ক্ষান্ত হয় না; সমাজে 'ভালো নাগরিক' বলতে কাকে বোঝানো হবে, সেই ধারণাকেও তারা আমূল বদলে দিতে পারে। সাধারণ অর্থে একজন ভালো নাগরিককে সমাজে গঠনমূলক ভূমিকা রাখা, আইন মানা এবং অন্যের অধিকারকে সম্মান করার মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু বিভ্রান্তিকর প্রচারে 'ভালো নাগরিক'-এর সংজ্ঞা সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে:

- **স্বৈরাচারী বক্তব্যে:** ভালো নাগরিক সেই ব্যক্তি, যিনি রাষ্ট্র বা নেতার বক্তব্য প্রশ্নহীনভাবে মেনে নেন।
- **চরমপন্থী বা ধর্মীয় বক্তব্যে:** ভালো নাগরিক হিসেবে তাঁকে দেখানো হয়, যিনি ধর্মের একটি সংকীর্ণ ব্যাখ্যা অন্ধভাবে অনুসরণ করেন এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের সম্পূর্ণ বর্জন করেন।
- **সংকীর্ণ আদর্শিক বক্তব্যে:** যিনি নিজের গোষ্ঠীগত পরিচয়কে একমাত্র সত্য বলে ধরে নেন এবং অন্যদের পরবাসী বা শত্রু মনে করেন, তাঁকেই আদর্শ নাগরিক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

চূড়ান্ত প্যারাডক্স: শত্রু, নায়ক ও নাগরিক—এই তিন ধরনের প্রচারের মূল লক্ষ্য একটাই: মানুষের চিন্তা ও আচরণকে একটি নির্দিষ্ট অভীষ্টের দিকে পরিচালিত করা। শত্রু তৈরি করা হয় ঘৃণার মাধ্যমে সমাজকে বিভক্ত করতে, নায়ক তৈরি করা হয় আনুগত্যের মাধ্যমে দলবদ্ধ করতে, আর 'সুনাগরিক'-এর নতুন সংজ্ঞা দিয়ে নির্ধারণ করা হয় সমাজে কাকে গ্রহণ করা হবে এবং কাকে নির্মূল বা বর্জন করা হবে। ফলে নাগরিকের স্বাধীন সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ একসময় কেবল মিডিয়ার নির্দিষ্ট বয়ান অন্ধভাবে অনুসরণ করার মধ্যে পর্যবসিত হয়।

'ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট' ও 'হাইপার-রিয়েলিটি'

এই পুরো প্রক্রিয়াটি অনুধাবন করার জন্য দুটি তাত্ত্বিক ধারণা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক:

১. 'Manufacturing Consent' বা 'সম্মতি উৎপাদন':

নোয়াম চমস্কি ও এডওয়ার্ড হারম্যানের এই মডেল অনুযায়ী, মিডিয়া সব সময় কেবল নিরপেক্ষভাবে সত্য তুলে ধরার কাজ করে না; অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থও মিডিয়ার বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কোন সংবাদ প্রচার করা হবে, কোন বিষয়কে লঘু করে দেখা হবে, কাকে নায়ক বা ভিলেন হিসেবে উপস্থাপন করা হবে—এসব সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা মানসিক ছবিও সুকৌশলে বদলে দেওয়া হয়।

২. 'Hyperreality' বা 'অতি-বাস্তবতা':

জাঁ বোদ্রিয়ারের ধারণা হলো, আধুনিক মিডিয়া কখনো কখনো বাস্তবতার কেবল ছবি তুলে ধরে না; বরং এমন এক কৃত্রিম বাস্তবতা তৈরি করে, যা একপর্যায়ে মানুষের কাছে আসল বাস্তবতার চেয়েও বেশি সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। তখন মিডিয়ায় তৈরি কল্পিত ছবিই মানুষের কাছে বাস্তবতার প্রধান মানদণ্ড হয়ে ওঠে। এখানেই ডিজিটাল বিভ্রান্তির সবচেয়ে বড় এবং গভীর বিপদ নিহিত।

চমস্কি দেখান কীভাবে মানুষের সম্মতি উৎপাদন করা হয়, আর বোদ্রিয়ার দেখান কীভাবে মিডিয়ার তৈরি কৃত্রিম ধারণা একসময় বাস্তবতার জায়গা দখল করে নেয়। এই দুই তাত্ত্বিক ধারণার মাঝে একটি শক্ত সেতুবন্ধন তৈরি করেছে এই নিবন্ধে আলোচিত ছয় ধাপের মডেলটি।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনায় আমরা দেখেছি, কীভাবে মানুষের মনে থাকা একটি সাধারণ ও পরিবর্তনশীল ধারণা ধীরে ধীরে একটি শক্ত ও অনমনীয় বাঁধাধরা ধারণায় পরিণত হতে পারে। এটি সব সময় স্বাভাবিকভাবে ঘটে না; বরং কখনো কখনো পরিকল্পিতভাবে একই নাম, একই বৈশিষ্ট্য, একই চিত্রকল্প ও একই আবেগ বারবার ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট এজেন্ডা মানুষের মনে স্থায়ী করে দেওয়া হয়।

তাই স্টিরিওটাইপকে কেবল একটি সাধারণ ভুল ধারণা বা কুসংস্কার হিসেবে দেখলে পুরো প্রক্রিয়াটি বোঝা যাবে না। এটি অনেক সময় জনমত গঠন ও সমাজকে নিয়ন্ত্রণের একটি কাঠামোগত হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

উল্লেখ্য, এই নিবন্ধের দ্বিতীয় অংশে ছবির নৃবৈজ্ঞানিক (Anthropological) শিকড় অনুসন্ধান করা হবে। সেখানে গুহাচিত্র থেকে শুরু করে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, কবিতা ও অলংকরণ হয়ে ডিজিটাল যুগের অ্যালগরিদম ও মিমস পর্যন্ত ছবির সুদীর্ঘ ইতিহাস ও রূপান্তর নিয়ে আলোচনা করা হবে। ■

পাহাড় থেকে সমুদ্র:
পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে রেয়ার আর্থের অদৃশ্য ভাণ্ডার?

দ্বীন মোহাম্মদ
সাংবাদিক ও লেখক

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের ভূপ্রকৃতিকে একসঙ্গে বিচার করলে বাংলাদেশের ‘রেয়ার আর্থ এলিমেন্ট’ (REE) বা বিরল মৃত্তিকা মৌলের সম্ভাবনায় দুটি ভিন্ন ভূতাত্ত্বিক উপাদান সামনে আসে–পার্বত্য চট্টগ্রাম হলো সম্ভাব্য ‘উৎস অঞ্চল’ (Source-rock), আর কক্সবাজার-টেকনাফ-মহেশখালী উপকূল হলো ইতোমধ্যে শনাক্তকৃত ভারী খনিজ ঘনীভবন অঞ্চল।

বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরীয় উপকূল এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য ভূখণ্ড বৈশ্বিক কৌশলগত খনিজ সম্পদের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার অঞ্চলকে ভূতাত্ত্বিকভাবে যুক্ত করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রযুক্তি খাতের অতিমূল্যবান উপাদান 'রেয়ার আর্থ এলিমেন্ট' (REE)-এর সম্ভাব্য ভাণ্ডার কেবল কোনো কাল্পনিক ধারণা নয়, বরং ভূতাত্ত্বিক প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি বাস্তব জাতীয় সম্ভাবনা।

১. কক্সবাজারঃ জোরালো প্রমাণভিত্তিক সম্ভাবনা

কক্সবাজার, টেকনাফ ও মহেশখালী উপকুলের বালিতে মোনাজাইট (Monazite), জেনোটাইম (Xenotime), জিরকন (Zircon), ইলমেনাইট (Ilmenite) এবং রুটাইলের (Rutile) মতো ভারী খনিজের উপস্থিতি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। এর মধ্যে মোনাজাইট হলো রেয়ার আর্থ মৌলের প্রধান বাহক–যাতে সিরাম, ল্যানথানাম, নিওডিমিয়াম এবং কিছু পরিমাণে প্রাসেওডিমিয়াম ও সামারিয়াম থাকে।

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশের উপকূলীয় বালিতে মোট ভারী খনিজের (Heavy-mineral content) পরিমাণ প্রায় ১ থেকে ৩০ শতাংশ, যার ৫ থেকে ১৫ শতাংশই রেয়ার আর্থ ধারণকারী খনিজ। বিশেষ করে কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তৃত ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলে ভারী খনিজের 'প্লাসার অবক্ষেপ' দীর্ঘদিন ধরে নথিবদ্ধ। গবেষণাগারের পরীক্ষায় এখানকার বালিতে সিরাম, ল্যানথানাম, প্রাসেওডিমিয়াম, নিওডিমিয়াম, ইট্রিয়াম, ইটারবিয়াম, গ্যাডোলিনিয়াম, ডিসপ্রোসিয়াম ও আরবিয়ামের মতো জটিল ও মূল্যবান বিরল মৃত্তিকা মৌলের উপস্থিতি নিশ্চিত করা গেছে।

২. মহেশখালীকুতুবদিয়াঃ উপকূলীয় খনিজের নতুন দিগন্ত

মহেশখালী, কুতুবদিয়া এবং সোনাদিয়া দ্বীপের সাম্প্রতিক সৈকত-

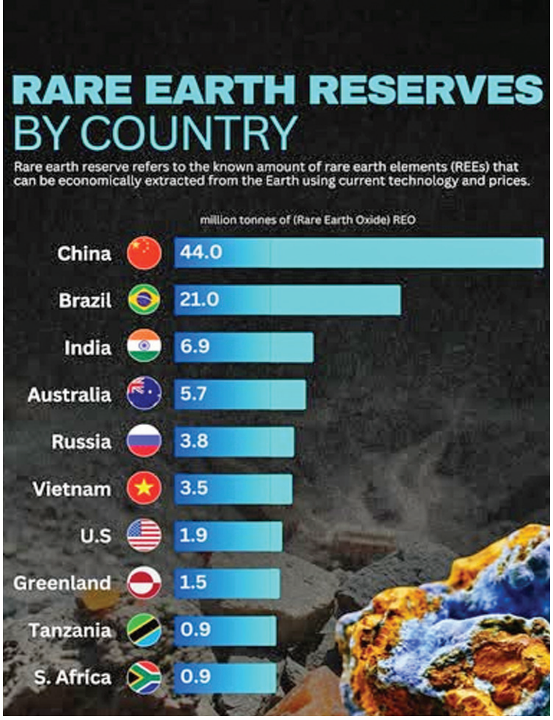

অবক্ষেপণ (Beach deposition) নিয়ে পরিচালিত আন্তর্জাতিক গবেষণায় রেয়ার আর্থ মৌলের উল্লেখযোগ্য পরিমাপ পাওয়া গেছে।

গবেষকদের মতে, এই সৈকত বালিতে জমে থাকা মোনাজাইট ও জিরকনের প্রধান উৎস চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা ফোল্ডেড বেল্ট এবং বৃহত্তর হিমালয় থেকে আগত পলি ব্যবস্থা। অর্থাৎ, কক্সবাজার উপকূলটি কেবল কোনো বিচ্ছিন্ন বালিয়াড়ি নয়; এটি বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বঙ্গোপসাগরীয় বৃহত্তম পলি-প্লাসার ব্যবস্থার (Bay of Bengal sedimentary–placer system) একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম: উৎস-শিলার ভূতাত্ত্বিক গুরুত্ব

পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো সরাসরি বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য রেয়ার আর্থের বিশাল মজুত প্রমাণিত হয়নি। ফলে সেখানে সরাসরি 'বিশাল ভাণ্ডার' ঘোষণা করা বৈজ্ঞানিকভাবে সমীচীন নয়। তবে কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে এই পাহাড়ি অঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম।

গবেষণায় দেখা গেছে, কক্সবাজার উপকূলে জমে থাকা ভারী খনিজের মূল ভূতাত্ত্বিক উৎস (Provenance) আসলে চট্টগ্রাম-আরাকান পাহাড়ি অঞ্চল এবং সংশ্লিষ্ট আগ্নেয় শিলা (Felsic/ Igneous rocks)। অর্থাৎ, দীর্ঘকালের আবহাওয়া ক্ষয়প্রক্রিয়ার (Weathering) ফলে পাহাড় থেকে এসব খনিজ ধুয়ে এসে উপকূলে জমা হয়েছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বেডরক (Bedrock), নদীর তলদেশের পলল (Stream sediment) এবং প্রাচীন অবক্ষেপে অনুসন্ধানের মাধ্যমে মোনাজাইট ও জেনোটাইমের প্রাথমিক উৎস-শিলা শনাক্ত করা সম্ভব।

৪. অর্থনৈতিক সম্ভাবনার আসল হিসাব

খনি বিজ্ঞানের মৌলিক নিয়মানুযায়ী: রেয়ার আর্থের উপস্থিতি, রেয়ার আর্থের মজুত ও বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য রিজার্ভ গুরুত্বপূর্ণ ।

কক্সবাজারে বিরল মৃত্তিকা খনিজের উপস্থিতি প্রমাণিত হলেও এটি বাণিজ্যিক সম্পদে রূপান্তর করতে বাংলাদেশকে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে:

আকরিক ও গ্রেড নির্ধারণ: নির্দিষ্ট এলাকায় ঠিক কত টন মোনাজাইট ও জেনোটাইম আছে এবং তাতে কৌশলগত মৌলগুলোর (যেমন: নিওডিমিয়াম, প্রাসেওডিমিয়াম, ইট্রিয়াম, ডিসপ্রোসিয়াম) প্রকৃত 'গ্রেড' কত?

পুনরুদ্ধার হার (Recovery rate) : বালু থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উপাদানগুলো আলাদা করার সক্ষমতা কেমন?

বর্জ্য ও বিচ্ছেদ ব্যয়: খনিজ থেকে তেজস্ক্রিয় উপাদান পৃথকীকরণের (Chemical separation) অর্থনৈতিক খরচ ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা লাভজনক কি না?

গবেষকদের মতে, বাংলাদেশে মোনাজাইট অনুসন্ধান এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। বাণিজ্যিক উত্তোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিস্তৃত 'রিজার্ভ অ্যাসেসমেন্ট' ও 'বেনিফিটেশন' সমীক্ষা জরুরি।

৫. ইন্টিগ্রেটেড ক্রিটিক্যাল-মিনারেলস মডেল

কক্সবাজারের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক সুবিধা হলো–এখানে রেয়ার আর্থকে কোনো একক খনিজ হিসেবে না দেখে একটি 'বহুমুখী সংকটপূর্ণ খনিজ সম্পদ' (Multi-mineral critical resource) হিসেবে প্রক্রিয়া করা সম্ভব। একই সৈকত-বালু থেকে সমন্বিতভাবে আলাদা করা যেতে পারে:
ইলমেনাইট ও রুটাইল: টাইটানিয়াম শিল্পের জন্য।
জিরকন: জিরকোনিয়াম ও হাফনিয়াম উত্তোলনের জন্য।
মোনাজাইট: রেয়ার আর্থ এবং থোরিয়াম শক্তির জন্য।
গার্নেট: শিল্প খনিজ বা ক্ষয়কারী উপাদান হিসেবে।
বাংলাদেশের জন্য কেবল "রেয়ার আর্থ মাইনিং" না করে একটি "ইন্টিগ্রেটেড ক্রিটিক্যাল-মিনারেলস রিকভারি সিস্টেম" গড়ে তোলা অর্থনৈতিকভাবে অনেক বেশি বাস্তবসম্মত ও লাভজনক হবে।

৬. প্রধান চ্যালেঞ্জ: থোরিয়াম ও পরিবেশগত ঝুঁকি

মোনাজাইটের সঙ্গে যুক্ত থাকে প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় মৌল থোরিয়াম ও ইউরেনিয়াম। গবেষণায় কক্সবাজারের উপকূলীয় অ্যাকুইফারে এই উপাদানগুলোর উপস্থিতি পাওয়া গেছে।

তাই যেকোনো বাণিজ্যিক উত্তোলন প্রকল্প শুরু করার আগে কেবল আর্থিক লাভ হিসাব করলেই চলবে না; বরং তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Tailings management), ভূগর্ভস্থ সুপেয় পানির সুরক্ষা এবং সংবেদনশীল উপকূলীয় পরিবেশের রেডিয়েশন নিরাপত্তার বিষয়টি প্রকল্পের মূল শর্ত বা 'রেড লাইন' হিসেবে নিশ্চিত করতে হবে।

৭. জাতীয় কৌশলগত সুযোগ

লাখো বছর ধরে হিমালয় ও পাহাড়ি অঞ্চল থেকে নেমে আসা পলি বঙ্গোপসাগরের প্র প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় জমার মাধ্যমে একটি বিশাল 'ভূতাত্ত্বিক ছাঁকন' (Geological sorting) সম্পন্ন করেছে। এই প্রাকৃতিক ছাঁকন প্রক্রিয়ার ফলেই মোনাজাইট, জিরকন, রুটাইল ও ইলমেনাইটের মতো ভারী খনিজগুলো উপকূলীয় নির্দিষ্ট অঞ্চলে ঘনীভূত হয়েছে।
অতএব, কেবল বিচ্ছিন্নভাবে "কক্সবাজারে খনিজ বালু আছে" না দেখে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পুরো কক্সবাজার উপকূলকে একটি সমন্বিত ভূতাত্ত্বিক ব্যবস্থা (Connected geological system) হিসেবে বিবেচনা করে সমন্বিত জাতীয় নীতিমালা গ্রহণ করাই হবে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে দূরদর্শী পদক্ষেপ। ■